বিজ্ঞানের ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ

অজয় রায়

> বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি এ নিয়ে মতৈক্যে আসা কঠিন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান হল শতাব্দী-প্রাচীন একটি প্রচেষ্টা যা পদ্ধতিগত চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চসমূহকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে একটি সংস্থার মধ্যে একত্রিত করে। সাহসের সাথে বলতে হলে বলা যায় যে ধারণা-প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির ভেতর দিয়ে অস্তিত্বের উত্তরকালীন পুর্নগঠনের এটি একটি প্রয়াস।[১]
>
> – আলবার্ট আইনস্টাইন

বিজ্ঞান- ধর্ম-দর্শন নিয়ে একাডেমিক ও মুক্ত আলোচনা আমাদের সমাজে কখনও স্বস্তিপ্রদ ছিল না, আজও নেই বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী উগ্র পরিবেশে।

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটির বিশালতা রয়েছে, রয়েছে বহুমাত্রিকতা। ইংরেজীতে প্রোপার্টি, কোয়ালিটি, ক্যারেক্টারিস্টিকস, এট্রিবিউটস প্রভৃতি শব্দের সাথে যুক্ত অর্থকেও আমরা অনেক সময় বাংলায় ধর্ম শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি। যেমন আমরা বলি জড়ের ধর্ম 'জাড্য' (inertia), আলোর ধর্ম 'ঔজ্বল্য', অগ্নির ধর্ম 'দাহিকা' ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে 'যা আমাকে ধারণ করে থাকে তাই আমার ধর্ম।' আবার ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটির বাংলাও আমরা ধর্ম করেছি, যদিও তা সঙ্কীর্ণ অর্থে। আমি ব্যাপক অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছি সঙ্কীর্ণ 'রিলিজিয়ন' অর্থে নয়।

এ দুটি শব্দের পার্থক্য বোঝাতে অধুনা অনেকে রিলিজিয়নের শব্দার্থ করেছেন 'উপাসনা ধর্ম'। অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষের যে ক্রিয়াকাণ্ড তাকেই বলা হয়েছে মানুষের উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন। এই অর্থে ইসলাম, খ্রীস্টিয়, হিন্দু এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন হিসেবে গণ্য করতে পারি। তবে রিলিজিয়ন' এর মূল ভিত্তি হল ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। কিন্তু রিলিজিয়ন বা উপাসনা-ধর্মই মানুষের একমাত্র ধর্ম নয়- এর বাইরেও মানুষের রয়েছে বৈচিত্রময় গুণাবলী বা ধর্ম, যাকে এক কথায় আমরা বলতে পারি 'মানব বা মনুষ্য ধর্ম', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'অতি মানবীয়তা' (super humanism), রয়েছে কসমিক রিলিজিয়ন (cosmic religion) বা মহাজাগতিক ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের মনুষ্য ধর্মের মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাক, যে কথাগুলো তিনি ১৯৩০ সাল থেকে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালা হিসেবে এবং পরবর্তীকালে কোলকাতা (১৯৩৩) ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩) প্রদান করেছিলেন ঃ

---

[1] A. Einstein, *Science, Philosophy and Religion*, a speech delivered in a symposium in 1940 (Published, New York, Harper, 1941); " It would not be difficult to come to an agreement as to what we understand by science. Science is the century-old endeavor to bring together by means of a systematic thought the perceptible phenomena of this world into as thoroughgoing an association as possible. To put it boldly, it is the attempt at the posterior reconstruction of existence by the process of conceptualization."

> "মানুষের একটি দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম. তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।
> কিন্তু, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।" (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)

মানুষের এই বিরাটত্বকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্বমানবতা অনুসন্ধান করতে হবে মানুষের অন্তরে, বাউল কবিরা যেমন বলতেন, "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।" নানা কবিতায় তাঁর 'তুমি' হলেন সেই অন্তরের মহামানব। নমুনা স্বরপ, গীতাঞ্জলি থেকে একটি কবিতার কয়েক ছত্র উল্লেখ করা যাক ঃ

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। (গীতাঞ্জলি)

কসমিক রিলিজিয়ন বা মহাজাগতিক ধর্ম সম্পর্কে দু-চার কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহাজাগতিক ধর্ম বলতে আমরা কী বুঝি, এর উৎস কোথায় এবং ভিত্তিই বা কি? একটু বিশদে যাওয়া যাক। ধর্ম সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিভিন্ন উক্তি ও লেখা বিশ্লেষন করে তাঁর ধর্ম-চিন্তাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'কসমিক রিলিজিয়ন'। আইনস্টাইনের মত মহান বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ বিজ্ঞানী যখন কোন চমকপ্রদ অবিষ্কার করেন তখন এক ধরনের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন তাঁরা এবং এক বিশেষ ধরনের আনন্দে আপ্লুত হন, যাকে বলা যায় স্বর্গীয়। নিউটনের সনাতনী বিশ্বচিত্রে, অথবা লর্ড কেলভিনের তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের চমৎকারিত্বে, অথবা ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের অসাধারন সরলতায়, কিংবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের অবিস্মরণীয় মনোহারিত্বে, স্রোডিংগারের তরঙ্গ সমীকরণের অনুপম সরল গড়নে ঐসব বরেণ্য বৈজ্ঞানিক থেকে বিজ্ঞান গবেষকরা যুগে যুগে বিস্ময়াভূত স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছেন; এই স্বর্গীয় আনন্দময় অনুভূতিকেই অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন ধর্মানুভূতি। এই অর্থে প্রতিটি বিজ্ঞানীই ধর্মপ্রাণ। এই ধর্মানুভূতিকেই বিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন 'কসমিক রিলিজিয়ন' বা 'মহাজাগতিক ধর্ম'।

একথা কেউ অস্বীকার করেন না যে প্রতিটি বিজ্ঞানীর (এমন কি দার্শনিকও) স্ব-উদ্ভাবনী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করেন সত্যের মূলনীতি ও সৌন্দর্য যা থেকে গবেষক প্রতিষ্ঠা করেন সার্থক তত্ত্ব – অভিজ্ঞতার বোধে যা সত্যে পরিণত হয়। একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদের এই সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনেকে বলেন 'কঠিন সত্য' (hard fact), আবার এই অভিজ্ঞতাকে কেউ আখ্যা দেন 'রহস্যময় অভিজ্ঞতা' (mysterious experience)। 'কঠিন সত্য'ই হোক আর 'রহস্যময় অভিজ্ঞতা'ই হোক – এই অনুভূতির প্রতিক্রিয়া এক এক জন বিজ্ঞানীয় এক এক ধরনের হতে পারে। আইনস্টাইন এই সত্যানুভূতিকেই বলেছেন 'কসমিক রিলিজিয়নের' ভিত্তি (.. .. this fact is the basis of cosmic religion)। এই ব্যক্তিগত প্রক্রিয়াকে 'কসমিক রিলিজিয়ন' বলা হলেও পদার্থাবদ্যার তথ্য ও নীতিমালা এর ইঙ্গিত বহন করে না; অবশ্যই ধারণা করা যেতে পারে যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া - যা বিজ্ঞানীর মনে

সৃষ্ট হয়, বিজ্ঞানে তার সুষ্টিশীল ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। তাইতো আইনস্টাইন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে, –

> " .. .. (this) knowledge, this feeling, is at the centre of true religiousness. In this sense, and in this sense only, I belong to the ranks of devoutly religious men. "

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইনস্টাইনের কাছে "গাণিতিক পদার্থবিদ্যার সম্ভাবনার (possibility)" মধ্যে এই বিশ্বাস প্রায় ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন (identical)। আইনস্টাইনের মহাজাগিতিক ধর্ম হচ্ছে একটি অপার সৌন্দর্মময় ও ধারণাগতভাবে সরল প্রতীকী পদ্ধতির সম্ভবনায় বিশ্ব্াস – যা থেকে নিরীক্ষিত তথ্যসমূকে যৌক্তিভাবে (logically) বের করে আনা যায়। নিউটোনীয় পদার্থবিদ্যা সপ্তদশ শতকে মহাজাগতিক ধর্মকে প্রথম তুলে ধরেছিল সেই অর্থে - ঠিক যে অর্থে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা মহাজাগতিক ধর্মকে তুলে ধরেছে।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ

স্থান কাল পাত্র ভেদে একটি শব্দের অর্থ বদলে যায়। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বিজ্ঞান শব্দটির যে অর্থ ছিল আজ আর তা নেই। শব্দগত অর্থে বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞান হল 'বিশেষ জ্ঞান' বা অনুপুঙ্খ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান কি কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর অথবা পরিপূর্ণ জ্ঞানের সামগ্রিকতাকে বোঝাবে তা অবশ্য শব্দগত অর্থ থেকে বোঝা যাবে না।

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের, বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের হাতে পড়ে বেদান্তবাদীরা বিজ্ঞানকে 'ব্রক্ষ্মজ্ঞানে' দাঁড় করিয়েছিলেন, আর বৌদ্ধাচার্যেরা বিজ্ঞানকে পরিণত করেছেন 'ব্িজ্ঞানবাদে' এবং 'শূন্যবাদে'।[২] একটু বিশদে যাওয়া যাক ঃ

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা বিজ্ঞান বলতে বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরানুভূতি সম্পর্কে যে তত্ত্বজ্ঞান–বিশেষ জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান তাই হল বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা যে অর্থে বিজ্ঞান বুঝেচেন তা হল ভাববাদী চরম বা পরম জ্ঞানকে অর্থাৎ বেদান্তবাদীর দৃষ্টিতে তা হল 'ব্রক্ষ্মজ্ঞান'। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে বিজ্ঞান দর্শন গড়ে উঠেছে তার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' যার সাথে বেদান্তবাদীর দেখার পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে আমাদের কাছে যে দৃশ্যমান বস্তু তা মনাজগতের একটি ভাব মাত্র এর বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ ধর্মে মূলত চার শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা সনাক্ত করা যায়, এর মধ্যে দুটি হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি মহাযান শাখার- এ দুটিকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ। হীনযানীদের দুটি শাখার প্রথমটিতে বলা হয়েছে 'বস্তুর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববোধই হল জ্ঞান', পরবর্তী ধাপে আর একটু এগিয়ে বলা হয়েছে যে 'ধারণার মধ্য দিয়ে সত্যের বোধ লাভ করা যায়'। এর ফলে ভাববাদের দিকে বৌদ্ধ দর্শন আরও এগিয়ে গিয়ে মন ও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের কুয়াশা বা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে, কিছুটা মিস্টিক বা রহস্যবাদেরও। অন্যদিকে মহাযানী দার্শনিকেরা এই পথে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন 'আমরা যে বস্তু সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করি তা হল ভাব থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিলিপি (replica), যার পশ্চাতে বস্তুর কোন প্রকৃত বা বাহ্য অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না। এটিই হল

---

[২] বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নেই–বস্তু হল মনোজগতের সৃষ্ট প্রতিলিপি (replica) মাত্র। আর নাগার্জুন (১ম শতাব্দী) প্রবর্তিত শূন্যবাদের মর্মকথা হল বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ কোনটিরই অস্তিত্ব নেই – সবই শূন্য (void)। নাগার্জুনের দর্শন চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় হিউম ও বার্গসোঁর চিন্তাধারায়।

বিজ্ঞান বাদীদের মূল কথা – আর সকল অভিজ্ঞাতাকে বলা হয়েছে ‘মনের মধ্যে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধারণা মাত্র’। এই দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী রূপ হল নাগার্জুনের সাপেক্ষবাদের ও অবচেতন সত্তার ধারণা যার ওপর ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর দর্শন প্রক্রিয়া যাকে বলা হয়ে থাকে ‘মাধ্যমিক বা মধ্যপথ’। এর অন্য নাম ‘শূন্যবাদ’। এই দর্শনের মূল কথাগুলো হচ্ছে – ‘মন ধারণায় বিশিষ্ট হয়, ফলে তখন থাকে কেবল কতকগুলো অসংহত ধারনা ও উপলব্ধি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাহলে আমরা পৌঁছে যাই এমন কিছুতে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন কিছু যা আমাদের সীমাবদ্ধ মনের অগম্য, আমরা প্রকাশ করতে পারি না, যার সংজ্ঞা দিতে পারি না। বড় জোর বলা যেতে পারে, এক প্রকারের সংবিৎ – বিজ্ঞান (কৌতুহলী পাঠকের জন্য এ নিয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে পরিশিষ্ট-১ এ)।

আধুনিক বিজ্ঞান

আধুনক বিজ্ঞানের সূচনা বলা যায় গ্যালিলিওর (১৫৫৯-১৬৪২) হাত থেকে সপ্তদশ শতকে[৩] যা পূর্ণতা পায় নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) প্রতিভার স্পর্শে প্রিন্সিপিয়ার প্রকাশের (১৬৮৭) মধ্য দিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) উদ্ধৃত উক্তির মধ্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। এরও আগে ১৯ শতকের ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩) বলেছিলেন ‘বিজ্ঞান হল সুসংগঠিত জ্ঞান’, আর উইলিয়াম হাজ্জিটির (Willium Haziiti: 1778-1830) ভাষায় বিজ্ঞান হচ্ছে ‘কারণ'কে জানার তীব্র এষণা’। সরল কথায় বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞান হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যদিয়ে বিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে সত্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে থাকেন। বর্হিজগৎ সম্পর্কিত যখন কোন ঘটনা ঘটে, এই ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানীর প্রয়োজন অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ– এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিমিত্ত বিজ্ঞানীকে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় উদ্ভাবন করতে হয়, এমনকি পর্যবেক্ষণকে আরও সুক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যেতে তৈরী করতে হয় যন্ত্রব্যবস্থা। অবশ্যই এই সত্য বা জ্ঞান আপাত (relative), কারণ বিজ্ঞানে পরম (absolute) বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীর ‘দেখা সত্য’ এবং ধর্মবাদী বা দার্শনিকের দেখা সত্য এক নাও হতে পারে, এমন কি দার্শনিক যদি বস্তুবাদীও হন। বস্তুবাদী দার্শনিকের বস্তু বা বর্হিজগৎ বিজ্ঞানীর দেখা বর্হিজগৎ এক নয়। একটি সহজ উদাহরণ দেই, যেমন মার্কসবাদী বস্তুবাদীরা বলে থাকেন ‘গতি হল জড়ের ধর্ম’ – কথাটা এক অর্থে সত্য আবার এক অর্থে সত্য নয়। কারণ পরম গতি বলে কিছু নেই, গতি বিষয়টি আপেক্ষিক। যে দর্শকের কাছে বস্তুটি গতিময় বলে মনে হবে, বস্তুটির সাথে চলমান কোন দর্শকের কাছে মনে হবে সেটি স্থির।

বস্তুর যান্ত্রিক ধর্ম (mechanical property) হল তার জড়তা বা জাড্যগুণ (inertia)। বস্তুর এই জাড্যগুণের আর এক প্রকাশ হল তার ভর (mass)। বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানের পথ একদিকে যেমন পরীক্ষণ নির্ভর, একই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকও। পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণকে বিজ্ঞানী যখন বুদ্ধিবৃত্তিক সংশ্লেষণের মধ্যদিয়ে একটি সাধারন সূত্র বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর অনুসৃত পথটিকে বলা হয় আরোহী (inductive) পদ্ধতি। এই তত্ত্ব থেকে তিনি যেমন সমকালীন ঘটনার ব্যখ্যা দিতে পারেন, তেমনি ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কেও পূর্বাভাষ দিতে পারেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানী তাঁর মনন মেধা সজ্ঞা-প্রজ্ঞার মাধ্যমে বর্হিজগৎ বা কোন স্থানিক ঘটনার বর্ণনার উদ্দেশ্যে কতকগুলো ধারণার মধ্য দিয়ে একটি মডেল নির্মাণ করেন এবং এর মাধ্যমে জাগতিক ঘটনাবলীর চমৎকার ব্যাখ্য দিতে সক্ষম হন, পরে ঘটতে পারে

[৩] গ্যালিলিও’র বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Dialogue’ প্রকাশিত হয় ১৬৩২ সালে।

এমন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষনে তা টিকলে মডেলটি তত্ত্বে উন্নীত হয়। এই পদ্ধতিকে সাধারণভাবে অবরোহী (deductive) বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম পদ্ধতির উদাহরণ হিসেবে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল উদ্ভাবিত তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৮৬৪ সালে তিনি বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও আলো সংশ্লিষ্ট নানা জানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে 'তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্র' নামে একটি একীভূত তত্ত্বে উপনীত হন, যার সার কথা মাত্র চারটি সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতির চমৎকার উদাহরণ হল নিউটনের গতির নিয়ম ও অভিকর্ষ তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আইনস্টাইন মাত্র দুটি অনুমিতির আশ্রয় নিয়েছিলেন (ক) আলোর গতি সকল সময়ে সকল স্থানে, পর্যবেক্ষণ নির্বিশেষে ধ্রুব, আর (খ) পদার্থবিদ্যার সূত্রাবলীর বা নিয়মের রূপ সকল জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোয় (inertial frame of reference) অপরিবর্তিত থাকবে (invariant)। অন্যদিকে, চিরায়ত বলবিদ্যার বিশাল কাঠামোটি নিউটন কথিত মাত্র তিনটি গতির নিয়মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সামান্য আভাস দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সামান্য মতভেদ রয়েছে। নির্ধারণবাদী (deterministic) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে বিজ্ঞান সাধনার মূখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে বোঝা, বর্হিজগৎ ও প্রকৃতির নিয়ম কানুন আবিষ্কার করে তার রহস্য ভেদ করা। আইনস্টাইন বলতেন, "পদার্থবিদ্যার চেষ্টা হল বাস্তবতার স্বরূপকে অনুধাবন করা, যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকেই বিদ্যমান। এই অর্থেই ভ্যেত বাস্তবতার কথা বলা হয়ে থাকে। কোয়ান্টাম পূর্ব সময়ে পদার্থবিদ্যায় এটি কী ভাবে বুঝতে হবে তা নিয়ে কোন দ্বিধা ছিল না। নিউটনের তত্ত্বে স্থান ও কালে একটি জড় বিন্দু দিয়ে বাস্তবতা নির্ণীত হত; ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে স্থান ও কালে একটি ক্ষেত্র দিয়ে।' অন্যদিকে অনিশ্চয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের মত হল প্রকৃতির নিয়ম ও বিধি উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞানীর কাজ নয়, বরং প্রকৃতি কী তার প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করাই বিজ্ঞানের কাজ। তাঁরা বলেন 'স্থুল জগৎ ও 'সূক্ষ্ম জগৎ' বা 'অব-পারমাণবিক জগৎ' নিয়ে বিভেদ রচনা করা নিরর্থক। 'কোয়ান্টাম জগৎ' বলে কিছু নেই। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে কোন বিজ্ঞানী কোন ভৌত প্রপঞ্চের কোয়ান্টাম বর্ণনা দিতে পারে মাত্র। এ প্রসঙ্গে আমরা অনিশ্চয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের প্রবক্তা নীলস বোরের একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি ঃ " 'প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা ' – এটি পদার্থবিদের কাজ নয়; বরং প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কী বলতে পারি এবং কী ভাবে বলতে পারি, – এটিই বিজ্ঞানের কাজ।" কিন্তু বিজ্ঞানের আসল বৈশিষ্ট্য হল জনকল্যাণে (অকল্যাণেও ?) এর প্রয়োগ-ধর্মিতা ও প্রযুক্তি। রকেট ও মিসাইল উৎক্ষেপন নিউটনের গতিবিদ্যার সফল প্রয়োগ, তাপ বলবিদ্যার ২য় সূত্রের সফল প্রযুক্তি হল তাপ-ইঞ্জিন, ভর-শক্তির সমতুল্যতা নীতি প্রয়োগে আণবিক চুল্লি বা এটম বোম্ব থেকে নিউক্লিয় শক্তির উদ্গীরণ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ নিবারণে পেনিসিলিনসহ নানা এন্টিবায়োটিকের সফল ব্যবহার ... বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ধর্মিতার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। প্রয়োগ-ধর্মিতা না থাকলে বিজ্ঞান বিজ্ঞান হতো না।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে এর কিছু কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন, বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণে অভীক্ষন সাপেক্ষে যুক্তিবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা। এটিই হল বিজ্ঞানের মূল ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান মনে করে পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ একটি বর্হিজগতের অস্তিত্ব আছে, যা কেবল আমাদের মনোজগতের সৃষ্ট কোন ভাবসমষ্টি নয়। আমরা প্রকৃতি বলতে যা বুঝি তা এই ভৌত জগতের প্রকাশ মাত্র।

বিজ্ঞানচর্চা কয়েকটি মৌলিক নীতির ওপর দণ্ডায়মান।

(১) সরলতার নীতি ঃ কোন বৈশ্বিক ঘটনাকে যতদূর সম্ভব সরলতম তত্ত্ব বা নিয়মের মাধ্যমে ব্যখ্যা দেয়া সম্ভব।

(২) সমতুল্যতার নীতি ঃ সমতুল্যতাও বিজ্ঞানের একটি ধর্ম - যেমন নিউটনের 'অভিকর্ষ ভর' এবং 'জাড্য ভর' সমতুল্য। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে জড় ও শক্তি পরস্পরের সমতুল্য। এই সমতুল্যতারই বাস্তব প্রয়োগ পারমাণবিক চুল্লি ও অ্যাটম বোমা। আবার কোয়ণ্টাম জগতে কণা ও তরঙ্গ সমতুল্য। অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন কণা মূলত কণিকা রূপে আমাদের কাছে সাধারণভাবে দৃশ্যমান হলেও অবস্থা বিশেষে জড়-তরঙ্গ রূপে আচরণ করতে পারে। চলমান ইলেকট্রন কণিকাসমষ্টি বিদ্যুৎ শক্তি রূপে দেখা দেয়- যার বাস্তব প্রয়োগ তো অহরহই দেখছি। আবার ঐ ইলেকট্রনসমষ্টিই কেলাসের মধ্যদিয়ে গমনকালে পরমাণুগুচ্ছের সাথে তরঙ্গরূপে মিথষ্ক্রিয়া ঘটিয়ে আলোর মতই ইলেকট্রন অপবর্তন প্রতিভাসের জন্ম দেয়। এই ইলেকট্রন তরঙ্গকেই ব্যবহার করে আমরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ক্ষুদ্র কণাকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করে দৃশ্যমান করে তুলি, যা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা দেয় না। আবার তরঙ্গ চরিত্রের আলোক রশ্মিই বস্তুকণা (ফোটন) রূপে দেখা দিয়ে আলোক-তড়িৎ প্রপঞ্চের (photoelectric effect) জন্ম দেয়। রশ্মি ও কণার সমতুল্যতার আর একটি নিদর্শন হল 'যুগ্ম কণিকার সৃজন' (pair production) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়া 'রশ্মির বিকাশ'। প্রথম প্রক্রিয়ায় রশ্মি থেকে কণিকা-প্রতিকণিকার (ইলেকট্রন-পজিট্রন) সৃষ্টি হয় ফলে রশ্মির বিনাশ ঘটে (annilation of radiation), আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় একটি কনিকা-যুগ্ম (ইলেকট্রন-পজিট্রন) মিলিত হয়ে তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ, যেমন গামা রশ্মি, সৃষ্টি করে।

(৩) একীভূত তত্ত্ব ঃ কতকগুলো ভৌত সত্তার সমতুল্যতা প্রতিষ্ঠার সম্প্রসারিত ও সার্বজনীন রূপই হল বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন একীভূত তত্ত্বের ধারণা। এটিকে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি – যথাসম্ভব কম সংখ্যক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে জাগতিক ঘটনার ব্যখ্যা দেয়া। এর অগ্রপথিক ছিলেন মহামতি নিউটন যিনি অভিকর্ষ থেকে প্রাকৃতিক নানা ঘটনাকে বলবিদ্যার (মেকানিকসের) আওতায় নিয়ে এসেছিলেন, এমন কি আলো'কেও তিনি মেকানিকসের ধর্ম হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন; অবশ্য এতে তিনি সফল হন নি। তাপের গতীয়তত্ত্ব ও তাপবলবিদ্যাও (thermodynamics) একীভূত হয়ে গেল। ইতোপূর্বেই বল হয়েছে যে, ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল আলোক-বিদ্যুৎ-চুম্বকত্ব আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র প্রপঞ্চসমূকে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সামগ্রিক একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন ।

নিউটনের বিশ্বে 'স্থান ও কাল' হল দুটি স্বতন্ত্র পরম সত্তা। নিউটনীয় সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক তত্ত্বানুযায়ী – 'সকল জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোয় বলবৈদ্যিক নিয়মাবলি একই রূপে দেখা দেয়'– যা পরম স্থানের ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু সমস্যা রয়ে গেল নিউটনীয় বলবিদ্যার সাথে ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্রতত্ত্বকে মেলান যাচ্ছিল না - দুটি শৃঙ্খলা স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে চলল। ম্যক্সওয়েলের সমীকরণগুলো গ্যালিলীয় স্থানান্তরে অপরিবর্তিত থাকে না, যা বিজ্ঞানীদের বিচলিত করে তুলেছিল। এই আপাত বিরোধিতা থেকে পদার্থবিদ্যাকে মুক্ত করলেন আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রস্তাবনা করে (১৯০৫)।

বিশদে না গিয়েও বলা যায় যে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব মেকানিকস ও তাড়িত-চৌম্বক ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আপাত বিরোধ মিটিয়ে দু'এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করল- গ্যলিলিয় স্থনান্তরের পরিবর্তে আরও সার্বজনীন লরেঞ্জীয় স্থানান্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নতুন ব্যবস্থায় নিউটনীয় বলবিদ্যা 'আপেক্ষিক তত্ত্বীয় বলবিদ্যা' (relativistic mechanics) নামে নতুন রূপ ধারন করল। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল যে আমাদের বর্হিজগৎ চর্তুমাত্রিক – তিনটি স্থানিক মাত্রার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত 'কাল'। স্থান ও কাল দুয়ে মিলে রচনা করল ইউক্লিডিয় চর্তুমাত্রিক স্থান-কাল সন্ততি (space time continuum)। দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বা দুটি স্থানিক বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব ধ্রুব নয়, নির্ভর করবে জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোর আপেক্ষিক গতির ওপর। গতির সাপেক্ষে দূরত্ব সঙ্কুচিত (contraction) হয় আর কাল-ব্যবধান বর্ধিত (time dilation) হয়; কাল-ব্যবধানের প্রসঙ্গ-কাঠামোর নির্ভরতার কারণে দুটি দূরবর্তী ঘটনার কাল-'যুগপত্ততা' (simultaneity) আর রইল না। ফলে দূটি বস্তু কণিকার মধ্যে তাৎক্ষণিক দূর ক্রিয়া (action at a distance) বলেও কিছু থাকতে পারে না (যেমনটি নিউটন ভেবেছিলেন)।[৪] ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি ও শক্তির সংরক্ষণ নীতি একত্রে একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে।

পদার্থবিদদের আর একটি চেষ্টা তাঁদের সূত্রে ব্যবহৃত সমীকরণ সমূহে ধ্রুবকের সংখ্যা যত কম রাখা যায়। ফলে কেবল মাত্র মাত্রাহীন ধ্রুবকসমূহই স্থান পাবে পদার্থবিদ্যার মৌলিক সমীকরণসমূহে। এটিকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের সরলীকরনের প্রকাশ। আইনস্টাইন এ প্রসঙ্গে উলেখ করেছেন ঃ

> আমি একটি উপপাদ্যের অবতারণা করতে চাই যা বর্তমানে কেবল প্রকৃতির 'সরলতা অর্থাৎ বোধগম্যতা'– এই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্য কিছুর ওপর নয় ঃ এ ধরনের স্বেচ্ছা আরোপিত কোন ধ্রুবক স্থান পাবে না; অর্থাৎ প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত নিয়মসমূহ যৌক্তিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যে সব নিয়মে যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত ধ্রুবকসমূহই স্থান পাবে। [৫]

কিন্তু সমস্যা রয়েই গেল। নিইটনীয় 'জাড্য ভর' আর 'অভিকর্ষ ভর' কি সমতুল্য? চমৎকার একটি পরীক্ষায় দেখা গেল যে দুটি ভর অবিকল ও অভেদ। আর একটি মুস্কিল হল ম্যাক্সলীয় তত্ত্ব রশ্মির শক্তি-ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে পারে না; এ ব্যাপারে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বও কোন সাহায্য করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ম্যাকের প্রশ্ন ছিলঃ "এটি কি করে হয় যে জাড্য প্রসঙ্গ ব্যবস্থাসমূহ অন্য সকল স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার চাইতে অনন্য" – এর একটি সদুত্তর খুঁজে পাওয়া চাই। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মন্তব্য ছিল ঃ "এই অবস্থা দৃষ্টে আমি নিশ্চিত হলাম যে বিশেষ আপেক্ষি তত্ত্বের কাঠামোয় অভিকর্ষ তত্ত্বের কোন সন্তোষজনক স্থান নেই।"[৬]

'জাড্য ভর' আর 'অভিকর্ষ ভরে'র সমতুল্যতা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত ও সরলরৈখিক জাড্য কাঠামোয় বন্দী পদার্থবিদ্যাকে মুক্তি দিতে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন

---

[৪] নিউনের মতে দূরবর্তী দুটি জড় কণিকার মধ্যে আকর্ষন তাৎক্ষণিক, এর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না। একেই বলা হয় দূর ক্রিয়া।

[৫] 'I would like to state a theorem which at present can not be based upon anything more than upon a faith in the simplicity, i.e., intelligibility, of nature: there are no arbitrary constants of this kind; that is to say, nature is so constituted that it is possible logically to lay down such strongly determined constants occur, ..'

[৬] This convinced me that, within the frame of the special theory of relativity, there is no room for a satisfactory theory of gravitation. (Ref: *Autobiographical notes*, Albert Einstein: Philosopher – Scientist, editor Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Evanston, Illinois, 1949).

(১৯১৫)। তিনি দেখালেন যে জাড্য ও অজাড্য (কোন জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে ত্বরিত প্রসঙ্গ কাঠামো) কাঠামো নির্বিশেষে পদার্থবিদ্যার নিয়মসমূহের রূপ (form) অপরিবর্তিত (invariant) থাকে। দেখা গেল যে কোন আপাত স্থির কাঠমোর সাপেক্ষে কোন 'ত্বরমান প্রসঙ্গ কাঠামোয়' অবস্থিত কণিকাকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে কণিকাটির ওপর যেন একটি বল ক্রিয়া করছে (এই বলকে বলা হয় ছদ্মবল)। এ থেকে আইনস্টাইন অবশেষে দেখালেন যে অভিকর্ষ আসলে কোন স্বতন্ত্র কোন ভৌত সত্ত্বা নয়। সাধারন আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে যে স্থান-কাল ইউক্লিডিয় চর্তুমাত্রিক নয়, রাইমেনীয় চর্তুমাত্রিক বক্র-জ্যমিতিক সন্ততি – যা কি না বদ্ধহীন কিন্তু সসীম (boundless and finite)। এই নতুন স্থান-কাল আর নিষ্ক্রিয় নয়, জড়ের উপস্থিতিতে এর বক্রতার পরিবর্তন হয় যা অভিকর্ষ ক্ষেত্র রূপে দেখা দেয়। অভিকর্ষকে আর ভৌত প্রতিভাস নয়, স্থান-কালের জ্যমিতিক ধর্মের প্রকাশ।

পরবর্তী ধাপ ছিল তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব সহ সাধারণ ক্ষেত্রকে এর অধীনে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা। বলাবাহুল্য আইনস্টাইনের পরবর্তীকালের নিরলস প্রায় একক প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। তিনি অভিকর্ষ ক্ষেত্র ও তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রকে সাধারণ আপেক্ষিক তত্বের কাঠামোতে একীভূত করতে পারেন নি। যদিও, সমগ্র ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য তিনি তাত্তিকভাবে চমৎকার চারটি ক্ষেত্র সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এই সমীকরণ চতুষ্টয় থেকে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে আমরা সহজেই বিশুদ্ধ অভিকর্ষ ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারি যা নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বকে সার্বজনীনতা প্রদান করে। আমরা উপনীত হতে পারি সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বেও। এই সমীকরণগুলো সম্পর্কে আইনস্টাইনের নিজের বক্তব্য ছিল ঃ 'আমার বিশ্বাস যে এই সমীকরণগুচ্ছ রচনা করবে অভিকর্ষ সমীকরণসমূহের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক সাধারনীকরণ। এদের ভৌত উপযোগিতা প্রমাণ করা সত্যিই হবে একটি দুঃসাধ্য সাধনা, কেবল মাত্র কিছু কিছু সন্নিকর্ষণ আনয়ন করা যথেষ্ট হবে না। তবে আসল প্রশ্ন হল ঃ এ সকল সমীকরণের সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়মিত সমাধান কী হবে ? .. .. '

আইনস্টাইন সফল না হলেও প্রকৃতিতে বিদ্যমান অভিকর্ষ, তাড়িতচৌম্বক, দুর্বল নিউক্লিয় ও সবল নিউক্লিয় বলসমূহকে একীভূত করার সাধনা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এগিয়ে চলছে, তবে খিন্ন পথে। ইতোমধ্যেই ষাটের দশকের শেষার্ধে গ্লাসো, সালাম ও ভাইনবার্গ তাড়িত চৌম্বক ও দুর্বল নিউক্লিয় বল দুটিকে একীভূত করেন (১৯৬৭); এই দুটি বলের একত্রিত নাম 'তাড়িত দুর্বল' (electro weak)। এ কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তাঁরা। এখন চেষ্ট চলছে 'তাড়িত দুর্বল' ও 'সবল নিউক্লিয় বল' দুটির একত্রিকরণের নিরলস চেষ্টা 'মহান একীভূত তত্ত্বাবলী'র মাধ্যমে।[৭] ইতোমধ্যে তত্তীয়ভাবে তাড়িত দুর্বল ও সবল নিউক্লিয় বল দুটির একত্রিকরণ সম্ভব হয়েছে। অভিকর্ষকে 'মহান একীভূত তত্তের ' ভাঁজে আনার চেষ্টা চলছে আধুনিকতম সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব ভিত্তিক ১০-মাত্রিক স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে। এই সর্বব্যাপী তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে 'সর্ববিষয়ের তত্ত্ব' (Theory of Everything: TOE) বা 'একীভূত সর্বাবষয়ের তত্ত্ব' (Unifued Theory of Everything: UTE)।

অসম্ভাব্যতার নীতি

পদার্থবিজ্ঞানে যেমন সমতুল্যতার নীতির প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তেমনি নীরবে এই বিজ্ঞানে কতকগুলো অসম্ভাব্যতার নীতি স্থান পেয়েছে। এই নীতিসমূহকে নিম্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ

[৭] তাত্ত্বিক ভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও পরীক্ষিত হয় নি; এই মহান তত্ত্বের ইংরজী নাম ঃ Grand Unified Theories: GUTs.

- তাপ বলবিদ্য থেকে দেখান হয়েছে যে ‘এমন কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় যা দিয়ে চিরন্তন’ গতি (perpetual motion i.e. perpetuum mobile) সৃষ্টি করা যায়।
- কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরম শূন্য তাপমাত্রা (0 K) অর্জন করা যাবে না।
- প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নিখুঁত স্ফটিক পাওয়া যাবে না বা ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত স্ফটিক তৈরী করা যাবে না।
- কোন জড় বস্তুর গতিবেগ মহাশূন্যে আলোর গতিবেগকে অতিক্রম করতে পারে না।
- কোয়ন্টাম জগতে দুটি ক্যানোনিকাল রাশির একই সাথে একশত ভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে পরিমাপন অসম্ভব (যেমন কোন কণিকার গতি ও অবস্থান)।
- একই সাথে কোন ভৌত সত্তা (যেমন আলো বা ইলেকট্রন) তার বিকিরণ ধর্ম ও জড় ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না। প্রকৃতি তা করতে দেয় না।
- এমন কিছু সত্তা রয়েছে যার অস্তিত্ব জাড্য (বা অজাড্য) কাঠামোয় সম্পাদিত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা অসম্ভব। যেমন পরম গতি, স্থানকালের পরমতা (absoluteness), ক্লাসিকাল পদার্থযিদ কল্পিত ঈথর ইত্যাদি।

এ ধরণের আরও উদাহরণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব

বিজ্ঞানের সমস্যা হল প্রকৃতিক কোন ঘটনার ব্যখ্যায় কোন তত্ত্বের অবতারণা করতে হলে কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদে আমরা বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারনা ও পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলব, এবং বিজ্ঞানের দর্শনের প্রসঙ্গটিও আসবে।

প্রকৃতির কোন ঘটনার ব্যখ্যায় প্রস্তাবিত কোন তত্ত্বকে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা প্রসঙ্গে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল: তত্ত্বটি অবশ্যই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূকে অস্বীকার বা বিরোধিতা (contradiction) করবে না। বরং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাবলী তত্ত্বীয় ভিত্তির সুনিশ্চিতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি অবশ্য বস্তুগত পর্যবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং তা স্বয়ং তত্ত্বটির অঙ্গনের (premises) সাথে সম্পর্কিত – অর্থাৎ অঙ্গনটিতে “স্বভাবিকতা”(naturalness) বা “যৌক্তিক সরলতা”র (logical simplicity) রয়েছে কি না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটির যথাযথ সূত্রায়ন কঠিন হলেও, স্মরণাতীত কাল থেকে তত্ত্বের নির্বাচনে এবং মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ সব কথা অবশ্য আমাদের কালের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের চিন্তা ধারার অনেকটা প্রতিধ্বনি। আইনস্টাইন তত্ত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises is, the more different kinds of things it relates, and the more extended is its area of applicability.[৮]

---

[৮] *Autobiographical Notes*, Albert Einstein, *Albert Einstein: Philosopher-Scientist*, Editor: Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Ecanston, Illinois, 1949

এ প্রসঙ্গে আমরা তাপবলবিদ্যার (thermodynamics) বিশাল ও ব্যাপক প্রয়োগের কথা বলতে পারি ।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক কর্তৃক বিকিরণের কোয়ন্টাম ধারণার (quantum concept of radiation) মধ্য দিয়ে ‘কৃষ্ণকায় বিকিরণের’ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় দেখা গেল প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে সমকালীন পদার্থবিদ্যার আলোকে তার সমাধান দেয়া যায় না । কেবলমাত্র জ্ঞাত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রকৃত নিয়মাবলী আাবিষ্কার করা সম্ভব নয়- এ কথা ভেবে আইনস্টাইন হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> The longer and more despairingly I tried, the more I came to the conviction that only the discovery of a universal formal principle could lead us to assured results. [৯]

তাপবলবিদ্যার ক্ষেত্রে এই সার্বজনীন নীতিটি ছিল যে ‘প্রকৃতির নিয়ম সমূহ এমন যে, চিরন্তন গতি (perpetuum mobile) সৃষ্টি করা অসম্ভব’ । প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সার্বজনীন নীতিটি হচ্ছে ‘বিকিরণের রয়েছে কোয়ান্টাম চরিত্র’ (quantum character) । বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আইনস্টাইনের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল যে এই সার্বজনীন নীতিটি হচ্ছে প্রথমত মহাশন্যে ‘আলোর দ্রুতি সকল জাড্য কাঠামোয় সমান এবং দ্বিতীয়ত লোরেঞ্জ স্থানান্তরের সাপেক্ষে পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয় (invariant)’ ।

অন্যদিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা উদ্ভাবন কালে হাইসেনবর্গের কাছে ‘অপর্যবেক্ষণযোগ্য ভৌত রাশি পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের সূত্রায়নে স্থান পেলে তা হবে অসম্পূর্ণ’ – এটি সাধারণ নীতি রূপে প্রতিভাত হয়েছিল । আবার তরঙ্গ বলবিদ্যার জনক শ্রোডিংগারের কাছে কণিকার যে তরঙ্গ চরিত্র রয়েছে তাকে একটি স্থান ও কালের অপেক্ষক φ (r,t) রূপে প্রকাশ করা যায়– এটিই ছিল তার কাছে সাধারণ নীতি এবং এর ভিত্তিতেই তরঙ্গ-অপেক্ষকের জন্য একটি চমৎকার সমীকরণ দাঁড় করিয়েছিলেন ।

কিন্তু অযুত ডলার মূল্যের প্রশ্ন হল ‘এই সার্বজনীন নীতি কী ভাবে পাওয়া যাবে ?’ আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সূচনায় সামান্য প্রাথমিক ধারণা াদতে পারে মাত্র, এর বেশী নয় । কোন ঘটনা বিশ্লেষণকারী নিয়মের আবিষ্কার করতে হলে বিজ্ঞানীকে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সার্বজনীন নীতিকে উদ্ভাবন করতে হবে । এই উদ্ভাবন কেবল পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত (empiric datum) বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না; এটি আসবে বিজ্ঞানীর মুক্ত চিন্তার (free thinking) ফসল হিসেবে । অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আমরা বড়জোর ঘটনার ব্যাখ্যাদায়ী একটি (বা একাধিক) অভিজ্ঞতাধর্মী সূত্র (empirical formula) অবিষ্কার করতে পারি, প্রকৃতির রহস্যভেদকারী কোন তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে পারব না । প্ল্যাঙ্ক কর্তৃক ১৯০০ সালে প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিতে (empirical method) কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সূত্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৪ সালে বিশুদ্ধ তত্ত্বীয়ভাবে একটি সার্বজনীন নীতিকে আশ্রয় করে বিকিরণের সূত্রের উদ্ভাবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই অনুমিতিটি ছিল, যা

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'কৃষ্ণকায় বস্তুটি (black body) রশ্মি শোষণকালে এবং নিঃসরণকালে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গকে গুচ্ছাকারে (in quantum) শোষণ বা নিংসরণ করে থাকে।'

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলতেন যে বিজ্ঞানের দর্শনে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা বর্তমান ঃ একটি হল অধিবিদ্যাগত (metaphysical) ও অন্যটি হল দৃষ্টবাদীসুলভ (positivistic)। আইনস্টাইনকে কিন্তু অধিবিদ্যার প্রবক্তা তো বলা যাবেই না, এমন কি তিনি প্রচলিত অর্থে দৃষ্টবাদী ছিলেন তাও প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

দৃষ্টবাদের আদি প্রবক্তা আগস্ট কোঁৎএ'র (August Comte: 1798-1867) মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যই জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যে পৌঁছাবার পথ। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ আর্নস্ট ম্যাকের হাতে আরও উন্নতি ও ব্যপকতা পায়। বিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাগোষ্ঠীর হাতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার অভুতপূর্ব উন্নয়নের আলোকে এই দৃষ্টবাদ 'যৌক্তিক দৃষ্টবাদে' (logical postivism) পরিণত হয়েছিল। অনেকে আবার এই বিজ্ঞান-দর্শনকে 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ' (logical empiricism) নামেও অভিহিত করে থাকেন। ১৮২৯ সালে কোঁৎএ লিখেছিলেন ঃ [১০]

> .. .. every positive theory has to be based on observations, it is on the other hand, also true that our mind needs a theory in order to make observations.

আর্নস্ট ম্যাক (Ernst Mach: 1838-1916) যে দৃষ্টবাদ গড়ে তোলেন তার সার কথা হলঃ বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী আসলে পরীক্ষণলব্ধ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার; জটিল উপাত্তসমূহকে মানবীয় বোধের উদ্দেশ্যে উপযোগী করে এসব (নিয়মাবলী) তৈরী করা হয়। অনেকে এ থেকে ভাবতে পারেন যে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী মনের বাইরে স্থিত বাস্তবতার সাথে যতখানি না সম্পর্কিত তার চাইতে মনের সাথেই এদের সম্পৃক্ততা অনেক নিবিড়তর। তিনি বলতেন যে ভৌত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হতে হবে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে সরলতম এবং যতদূর সম্ভব স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত আকারে (Economical abstract expression) তুলে ধরা। স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মন কী ভাবে প্রকৃতির বিশালতাকে ধারন করে উপস্থাপন করে – তা বোঝা বেশ শক্ত ব্যাপার– এর সামান্যই সে অনুভব করতে পারে। একজন বৈজ্ঞানিক কী ভাবে বিজ্ঞানের গবেষণায় ও তথ্য বিশ্লেষণে অগ্রসর হয় সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল : [১১]

> In mentally separating a body (representing a physical reality) from the changeable environment in which it moves, what we really do is to extricate a group of sensations on which our thoughts are fastened and which is of relatively greater stability than the others, from the stream of all our sensations.

ম্যাক প্রত্যক্ষ বর্ণনা আর অপ্রত্যক্ষ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রথমটি সরাসরি অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তের সাথে জড়িত; অন্যদিকে, শেষোক্ত বর্ণনায় পর্যবেক্ষণলব্ধ পদের কোন স্থান নেই এই বর্ণনা দেয়া হয় গাণিতিক পরিকল্পনার (mathematical scheme) সাথে তুলনা করে।

বিজ্ঞানকে অনেক সময়ই 'বিচার ও ভ্রান্তি'র (trial and error) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যেমন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর তুলনা এবং সুবিন্যস্ত করতে এ ধরণের পদ্ধতি

---

[১০] Positive philosophy (A. Comte, *Cours de philosophie positive*, Premiere Lecon)

[১১] Ernst Mach, *The Principle of Comparison in Physics,* Popular Scientific Lectures, 1894

বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করেন। এই সুশৃঙ্খলকরণের ফলে বিমূর্ত ধারণা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিগুলো বেরিয়ে আসে। ধারণাগুলো অর্থবহ তখনই হয়ে ওঠে যখন আমরা যে বস্তুর সাথে এ ধারণাগুলো যুক্ত সেই বস্তুটিকে নির্দেশ করতে পারি। [১২]

অনেকে বলে থাকেন যে আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের গবেষণায় ম্যাকের চিন্তাধারা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব উদ্ভাবন কালে কিন্তু আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে ম্যাকের এই প্রত্যয় অতিসরলীকরণ। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে পদার্থবিদ্যার সাধারণ বাক্যগুলো আসলে প্রতীকসমূহের মধ্যে (যেমন সাধারণ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা, অভিকর্ষ বিভব ইত্যাদি .. ..) পারস্পরিক সম্পর্কাদির প্রকাশ, যা থেকে সিদ্ধান্ত টানা যায়, এবং সে সব সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণীয় রাশিগুলো সম্পর্কিত বাক্যাদির মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য । পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ নীতিতে উত্তরণের যে সহজ রাস্তা ম্যাক দেখাতে চেয়েছেন, আইনস্টাইন কিন্তু তা সহজে মানতে রাজী নন। ১৯৩৩ সালে তিনি এ প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছিলেন তা হল উনবিংশ শতাবদীর প্রকৃতিক দার্শনিকেরা মনে করতেন যে পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলো ও স্বীকার্যসমূহকে (postulates) নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার (abstraction) মধ্যদিয়ে – অর্থাৎ যৌক্তক উপায়ে অভিজ্ঞতা থেকে বের করা যায় (deduce); এরা যৌক্তিক ধারনায় মনুষ্য মেধার মুক্ত উদ্ভাবন নয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন:

> A clear recognition of the erroneousness of this notion really only came with the general theory of relativity, .. . the fictitious character of the fundamental principles is perfectly evident from the fact that we can point to two essentially different principles, both of which correspond with experience to a large extent. ..

এই ভিত্তিগুলো হচ্ছে নিউটনের এবং আইনস্টাইনের অভিকর্ষ নীতি দুটি। আইনস্টাইন আরও বলেছেন যে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বলবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহ ও স্বীকার্যসমূহ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে যৌক্তিক আহরণের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। নিঃসন্দেহে বেশ কঠোর উক্তি। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে পদার্থবিদ্যার সাধারণ নীতিসমূহ সূত্রায়িত হয়েছে এমন সব শব্দ ও প্রতীক ব্যবহার করে – যারা গাণিতিক ও যৌক্তিক উপাদানের দীর্ঘ শৃঙ্খলের দ্বারা পর্যবেক্ষনীয় ধারণাগুলোর সাথে সম্পর্কিত। আইনস্টাইন এর সাথে আরও যুক্ত করেছেন ঃ এ সব সাধারণ নীতিমালার কিছু ফল অবশ্য থাকতে হবে আর তা হল এ সব নীতিমালা পর্যবেক্ষনীয় ধারণাসমূহের মাধ্যমে সুত্রায়িত করা যাবে এবং যেগুলোকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন দ্বারা যাচাই করা যাবে। এই অর্থে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃষ্টবাদী বলে, ব্যপকতর অর্থে, অনেকে অনুযোগ করতেই পারেন। তবে আইনস্টাইন, ম্যাকের বিপরীতে মনে করেন যে বিজ্ঞানের নিয়মাবলী ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে পথটি হল দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর– মোটেই সহজ ও সরল নয়, যেমনটি ম্যাক বা তাঁর অনুসারীরা ভাবতেন। বরং নব্য যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি আইনস্টাইনের কাছকাছি। এঁদের মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় নিয়মাবলীকে সরল ধারণার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এই নীতিসমূহকে মনে করা হয় মুক্ত মানবীয় কল্পনা শক্তির (imagination) ফসল এবং এসব নীতিমালায় যে কোন “বিমূর্ত পদ” বা প্রতীক অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তবে এসব নীতি কোন ক্রমেই কল্পনার দ্বারা, সজ্ঞার (intution) মাধ্যমে, কিম্বা এমন কি যৌক্তিক সারল্য বা সৌন্দর্যের প্রতি আবেদন করে প্রমাণিত করা বা এর বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

[১২] Physikalische Zeitschrift (XVII, 1916) 'এ প্রকাশিত আর্নস্ট ম্যাকের ওপর প্রকাশিত আইনস্টাইন লিখিত জীবনগাথা- এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

নীতিসমূহকে 'সত্য' বলে গণ্য করা হবে যদি যৌক্তিক সিদ্ধান্ধ দ্বারা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোকে আহরণ করা সম্ভব, যা প্রকৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। আইনস্টাইন বেশ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে বিজ্ঞানের নীতিমালা অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার তত্ত্বসমূহে এমন সব অস্ত্র মজুত থাকে যেগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাকে সযত্নে জরিপ করতে পারি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে এসব অন্ত্র-কৌশল মানবীয় ধীশক্তিরই (human ingenuity) উদ্ভাবন। এ প্রসঙ্গে তিনি পূর্ণসংখ্যার উদাহরণ টেনে উক্তি করেছেন ঃ

> .. .. .. The series of integers is obviously an invention of human mind, a self created tool which simplifies the ordering of certain sensory experiences.[১৩]

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পথ-পন্থা নিয়ে আমরা আইনস্টাইনের চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিশিষ্টে তুলে ধরলাম (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)।

তবে চুম্বক কথাগুলো হচ্ছে ঃ-

১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সমন্বিত করা এবং একটি যৌক্তিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা। যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো হলো "মনুষ্য মনের মুক্ত সৃজন"। [১৪] বিজ্ঞানীর মেধার 'মুক্ত উদ্ঘাটনের' ওপর গুরুত্ব দিলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকার কথা তিনি ভুলে যা নি; একই সাথে পরপরই তিনি বলেছেন, " Experince may suggest the appropriate mathematical concepts, but they most certainly cannot be deduced from it." আরও বলেছেন যে, 'কোন গাণিতিক গড়নের ভৌত উপযোগিতার একমাত্র নির্ণায়ক এখনও অবশ্য অভিজ্ঞতা; কিন্তু সৃজনশীল নীতি রয়েছে গণিতের মধ্যেই। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে .. .. আমি সত্যি বলে মনে করি যে বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবতাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি, যা আমাদের প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন।'
২. তত্ত্বীয় পদার্থবদ্যার উদ্ভাবনী তত্ত্বের, মধ্য দিয়েই ভৌত বাস্তবতাকে বোধগম্য করে তোলা যায়। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে জগৎ বোধ্য, আর এটি হল সবচাইতে অবাক করা কাণ্ড।[১৫]
৩. আইনস্টাইন ভৌত তত্ত্বের সরলতার ওপর জোর দিয়েছেনঃ nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ম্যাক্সওয়েলের অনুপম সমীকরণসমূহের কথা অথবা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর চমৎকারিত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি।
৪. তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায় যে আমরা জ্ঞানের দুটি আপাত অ-পৃথকযোগ্য উপাংশের মুখোমুখী হয়েছি ঃ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং যুক্তিসিদ্ধ (rational) জ্ঞান। আইনস্টাইনের মতে, বিশুদ্ধ যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। তিনি একটি চমৎকার উক্তি করেছেন ঃ "All knowledge of reality starts from experience and ends in it."

---

[১৩] Albert Einstein, *Remarks on Bertrand Russell's Theory of Knowledge,* (Paul A. Schilpps, *The Pgilosophy of Bertrand Russel,* 1944, p 287)

[১৪] Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal,* 121, 1936.

[১৫] 'The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.', Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal,* 121, 1936.

প্রশ্ন হল এমন কি কোন নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার সাথে সঙ্গতি রেখে ধারণাগুলোর সাথে সংবেদনগুলোর একটি সুসমন্বয়ী নির্বাচন সম্পাদন করা যেতে পারে। এডিংটনের মত বিয়য়াশ্রিত দার্শনিক বিজ্ঞানী হয়তো বলতেন 'অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে', কিনতু আইনস্টাইনের উত্তর খুব সম্ভব হবে সুনির্দ্দিষ্ট 'না', কারণ আইনস্টান বারবার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে 'ধারণা' নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা থেকে উদিত হয় না।

দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এই যে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলে মনুষ্য কল্পনাপ্রসূত তা থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত টানতে পারেন যে, আমরা বিজ্ঞানের সুনির্দ্দিষ্ট মৌলিক নীতিমালায় (definitive basic principles) হয়তো কখনও পৌঁছাতে পারব না। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যেমন পদার্থবিজ্ঞানী এবং 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের' (logical empiricism) প্রধান প্রবক্তা হেনরী পয়ঁকার (Henri Poincare), যে পদার্থবিদ্যায় এ ধরনের কোন 'সঠিক ভিত্তি' কি থাকতে পারে? আইনস্টাইন কিন্তু এসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। হার্বার্ট স্পেনসার বক্তৃতায়, ১৯৩৩ সালে, তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

> If it is true that this axiomatic basis of theoretical physics cannot be extracted from experience but must be freely invented, can we ever hope to find the right way? Nay more, has this right way any existence outside our illusion.. .. I answer without hesitation that there is, in my opinion, a right way, and that we are capable of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas. I am convinced that we can discover by means of purely mathematical constructions the concepts and the laws connecting them with each other, which furnish the key to the understanding of natural phenomena. [16]

যেহেতু তত্ত্বীয় উপাংশটি অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা যায় না, তাই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা নিজস্ব কিছু অবদান প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ধারণাতে রাখতে পারে। এর অর্থ হল বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে দৃষ্টবাদের কোন স্থান নেই কারন দৃষ্টবাদী তত্ত্বানুসারে সকল তত্ত্বীয় তাৎপর্য আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্ঞানতত্ত্বে এর একটি গুঢ় তাৎপর্য রয়েছে কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের বিষয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, শুধু মাত্র বিষয়াশ্রিত গড়নের (subjective construct) জ্ঞান নয়। এই সিদ্ধান্ত থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তা হল বস্তুর স্ব-সত্তা'কে (thing in itself) বৈজ্ঞানিক পন্থায় জানা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেই বস্তুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি; যেমন একঝাঁক ইলেকট্রনের ওপর গবেষণাগারে নানা ধরনের পরক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি – টিভিতে ছবি উৎপাদনে ব্যবহার করি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে 'আলোক বীম' হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এবং দৈনন্দিন জীবনে ধাতব তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ শাক্তি উৎপাদন করি। সুতরাং বিজ্ঞান দাবী করতে পারে যে সে তত্ত্ববিদ্যাকে (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্বকে (epistemology) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মর্যাদায় পুর্নস্থাপন করেছে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি

অন্যদিকে বর্হিবিশ্বের বোধগম্যতা নিয়ে প্ল্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। আমরা বর্হিজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু এর অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। পদার্থবিদ্যায় আমরা যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করি তা বিশ্বচিত্রের উপাদান যা অনেকটাই স্বেচ্ছাক্রমে নির্বাচিত; বিশ্বচিত্রে পর্যবেক্ষণীয় রাশির স্থান নেই। পর্যবেক্ষণীয় রাশিগুলো অভিজ্ঞতার বিশ্বের অধিবাসী; এই অভিজ্ঞতা নির্ভর বিশ্বের পেছনে রয়েছে প্রকৃত

---

[১৬] Albert Einstein, *Herbert Spencer Lecture*, in *The World As I see It*, p 36, 1933

বা আসল জগৎ (real world) যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি কেবল মাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। প্ল্যাঙ্ক এই 'প্রকৃত জগৎকে' মনে করেন 'পরম' (absolute) রূপে, আর এই পরমকেই তিনি পদার্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন – শক্তির এবং এনট্রপি'র পরম মান দিয়ে (absolute value), এমন কি স্থান-কালের পরিমাপন বিষয়েও। প্ল্যাঙ্ক তাঁর আত্মকথায় বলেছেন ঃ

> .. .. In this it is of essential significance that the external world represents something independent of ourselves, something absolute that we are facing, and the search for the laws that hold for this absolute seem to me the most satisfying task for the life's work as a scientist.[১৭]

অভিজ্ঞতার জগৎ ও ধারনাগত জগতের মধ্যে যে ব্যবধান তার সেতুবন্ধনের চেষ্টা অনেকের কাছে মনে হতে পারে কান্টিয় সমাধানের মত। প্ল্যাঙ্ক যখন বলেন যে চিন্তন প্রক্রিয়ার নিয়মসমূহ ইন্দ্রিয়ানুভূত সংবেদনের পথের সাথে মিশে যায়, তখন মনে হয় তা কান্টের সজ্ঞার রূপরেখার ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে সেতুবন্ধনের মত – যার ফলে বর্হিজগতের বোধগম্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই দুই জগতের মধ্যে আইনস্টাইনের সেতু বন্ধনের প্রয়াস কিছুটা ভিন্নতর– বিষয়টি তিনি ব্যক্তি বিজ্ঞানীর হাতেই ছেড়ে দিতে চান, তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সেতু বন্ধনের যথাযোগ্য পথ খুঁজে অবশ্যই পাওয়া যায়। পথ অনুসন্ধানের যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা তার একটি উক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন :

> .. without hesitation there is, in my opinion, a right way, and that we are capable of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that nature is the realization of the simplest conceivable mathematical ideas. I am convinced that we can discover by means of purely mathematical constructions the concepts and the laws connecting them with each other, which furnish the key to the understanding of natural phenomena.[১৮]

অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে তিনি তাঁর বিজ্ঞানানুসন্ধানে 'বর্হিজগতের বাস্তবতা'কে প্ল্যাঙ্ক যে ভাবে বিবেচনায় এনেছেন সেভাবে আনেন নি। কিন্তু অভিযোগটি সত্য নয়। আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট ঃ

> The belief in an external world independent of the perceiving subject is the basis of all natural science. Since, however, sense perception only gives information of the external world or of the physical reality indirectly, we can only grasp the later by speculative means.[১৯]

প্ল্যাঙ্কের উক্তির সাথে এই উক্তির কোন গুণগত ভেদ আছে বলে মনে হয়না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আইনস্টাইনের পূর্বানুমতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কোন ভৌত তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণের একটি

---

[১৭] M. Planck, *Wissenschaftliche Selbstbiographie*, Leipzig, 1948

[১৮] Albert Einstein, 'Clerk Maxwell's influence on the Evolution of the Idea of Physical Reality' in *The World as I see it* , New York, 1934, p 36

[১৯] ঐ, পৃ ৬০

আবশ্যিক শর্ত হওয়া চাই সরলতার নীতি আর এই ভিত্তি থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থবিদ্যার যৌক্তিক তত্ত্বটিও ধারণ করবে সারল্য ধর্ম। আসল কথাটি হল একটি ভৌত তত্ত্বের জন্য এক জাতের গণিতকে নির্বাচন করতে হবে যা সামগ্রিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি সুসংহত অর্থাৎ সংসক্ত তত্ত্বকে সুন্দরভাবে বর্ণনা দানে সক্ষম। তবে বৈজ্ঞানিক কী ভাবে গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন করেন সে সম্পকে তাঁর শেষ কথা হল ঃ

> If you want to find out anything from the theoretical physicists about the methods they use, I advise you to stick closely to one principle: don't listen to their words, fix your attention on their deeds.[২০]

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাথে দর্শনের পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে – দার্শনিকের জ্ঞান মনোজগৎ নির্ভর, এবং জ্ঞানীর নিজস্ব ভূবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্ব একদিকে যেমন বিশুদ্ধ চিন্তার ফসল তেমনি অভিজ্ঞতা লব্ধ বাস্তব জগতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবল ব্যক্তি জ্ঞানীর অধ্যাত্মীয় (subjective) বিষয় নয়, এই জ্ঞান অতি অবশ্যই মূলত বস্তুগত (objective) ।

ঐ যে আইনস্টাইন প্রায়শ বলতেন ' I hold it true that pure thought can grasp reality, as the ancient dreamed ' – এই উক্তির তাৎপর্য উপরের আলোচনায় নিশ্চয় খানিকটা প্রস্ফুট হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষযটির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ টেনে। আমাদের ভৌত জগৎ একটি চতুর্মাত্রিক সন্ততি (স্থান-কাল) (four dimensional continuum) মাত্র, যা রিম্যান্নীয় বক্র জ্যামিতিক ধর্ম মেনে চলে, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি নয়। এই সাধারণ তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে যে প্রকৃতির অভিকর্ষ ক্ষেত্র আসলে স্থান-কালের বক্রতার প্রকাশ। স্থান-কালের সাথে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ অভিকর্ষের সম্পর্ক আইনস্টাইন কী ভাবে স্থাপন করলেন সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "If I assume a Riemannian metric in it (space-time) and ask what are the simplest laws which such a metric system can satisfy, I arrive at the relativistic theory of gravitation."

অনুরূপভাবে, মুক্তস্থানে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের উপস্থিতি অনুমান করে তিনি ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ সমূহে উপনীত হয়েছিলেন। স্থান-কাল কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, অতি অবশ্য ভৌত বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্বে স্থান-কালের গড়ন হল জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বস্তুরই গড়ন; স্থান-কালের রূপরেখা ভৌত প্রকৃতিতে অবস্থান করে, কোন জ্ঞানীর মস্তিষ্কে নয়।[২১] এ থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি আইনস্টাইনের উক্তিটির তাৎপর্য। আর এখানেই নিহিত রয়েছে কান্টিয় জ্ঞানতত্ত্বের সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্বের পার্থক্য, যিনি বলেন স্থান ও কাল দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, উপরন্তু : space and time are

---

[২০] ঐ, পৃ ৩০

[২১] এ প্রসঙ্গে নর্থপ উক্তি করেছেন : .... 'Ultimate basis of space-time in the public, contingent, physical object of knowledge, rather than in the necessary constitution of the epistemological knower ..' (F.S.C Northrop, Einstein's Concept of Science in *Albert Einstein: Philosopher Scientist,* Ed. Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosopher, Inc., Evaston, Illinois, 1949)

empirically real, but transcendtlly ideal ' । এবং স্থান ও কাল সম্পর্কে এই ধারণা মানব মনে পূর্ব থেকেই প্রোথিত (a priori) । এই অর্থে আইনস্টাইনসহ সকল বিজ্ঞানীই অকান্টবাদী ।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তাত্ত্বিক উপাদানটি যে মনুষ্য মেধার 'মুক্ত উদ্ভাবন' এ কথটি উল্লেখ কালে আইনস্টাইন নিউটনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, 'নিউটন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ব্যাপক এবং কার্যকর পদ্ধতির স্রষ্টা হয়েও, বিশ্বাস করতেন যে তাঁর পদ্ধতির মৌলিক ধারণাসমূহ এবং নিয়মাবলী অভিজ্ঞতা থেকে বের করে আনা যায় । সন্দেহ নেই এটিই হল তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ' hypotheses non fingo (I feign no hypotheses).. .. 'র তাৎপর্য । ' আইনস্টাইন খেদের সাথে বলেছিলেন যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিউটোনীয় সিসটেমের অভূতপূর্ব সাফল্য স্বয়ং নিউটন ও সমকালীন বিজ্ঞানী ও দার্শনিককুলকে নিউটোনীয় পদ্ধতির ভিত্তির কল্পনিক চরিত্রকে বুঝতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । উপরন্তু সেকালের প্রাকৃত দার্শনিকেরা (natural phiosopher) বিশ্বাস করতেন যে পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহ ও স্বীকার্যসমূহ যৌক্তিক বিবেচনায় মনুষ্য মেধার 'মুক্ত উদ্ভাবন' হতে পারে না; বরং নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞকা থেকে আহরণ করা যেতে পারে ।

নিউটন তাঁর বৈজ্ঞানিক পন্থার যে পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর নীচের উক্তি থেকে বেরিয়ে আসে ঃ

> I have not as yet been able to discover the reason for these properties of gravity from phenomena, and I do not feign hypotheses. For whatever is not deduced from the phenomena must be called a hypothesis; and hypotheses, whether metaphysical or physical based occult qualities or mechanical, have no place in experimental philosophy. In this philosophy particular propositions are inferred from the phenomena, and afterwards rendered general by induction.[২২]

বোঝাই যাচ্ছে আইনস্টাইনের বিপরীতে নিউটন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরোহী পথ অনুসরণের পক্ষপাতী যার শুরুটা হবে প্রতিভাস থেকে, যদিও তিনি কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন ।

অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ এবং ঈশ্বর বিভ্রান্তি

এতক্ষণ বিজ্ঞানের ধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করলাম তা বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ অঙ্গনে নিজেকে বন্দী রেখে । এ আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে বিজ্ঞান গবেষণায় অলৌকিকতা, অধিবিদ্যা বা অধ্যাত্মবাদের এবং পরম সত্তার কোন স্থান নেই । কিন্তু শুধু বিজ্ঞান নিয়েই তো মনুষ্য জীবন নয় । এ জগতের বাইরে রয়েছ অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরবাদ, ভাববাদ, অধিবিদ্যা ও ধর্মের জগৎ । এ জগতের সাথে বিজ্ঞানর জগতের মিথষ্ক্রিয়া ঘটা স্বাভবাবিক । ভাবলোকের বাসিন্দারা তারা; প্রতীচ্য বা প্রাচ্য যে দার্শনিক পথের অনুসারীই হন, তাদের সার কথাটি হল 'ভৌত বাস্তবতা বা বস্তু জগৎ বলে কিছু নেই, বস্তু জগৎ বলে যা প্রতীয়মান হয়, তা আসলে মনোজগতের সুষ্টি, সেখানেই তার অস্তিত্ব । নাগার্জুন তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন মনোজগৎ বলেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই । সব শূন্য । ঈশ্বরবাদী বা ধর্মবাদীরা, অন্যদিকে, এক ধরনের ইহজগতে বিশ্বাসী । এরা প্রায় সবাই ঈশ্বর নামের একটি পরম সত্তায় বিশ্বাসী,

[২২] Sir Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia, 1687

যিনি সৃষ্টির অতীত, স্বয়ম্ভু , সর্বব্যাপী এবং সকল ক্ষমতার আধার ।[২৩] ইনি চরিত্রে ব্যক্তি ঈশ্বর, মানুষের ভাল মন্দের বিচারক, ভাল কাজে পুরস্কার ও মন্দ কাজে শাস্তি দেন । কিন্তু মুস্কিল হল এই সর্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাঁদের অনুসারীরা পারেন না । ভাববাদী ভুয়া দর্শনের যুক্তি, তাঁর অলৌকিত্ব, ধমক ভয় ভীতি এবং পরকালে পুরস্কারের লোভ দেখিযেও যখন ধর্মবাদীরা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হলেন তখন তাঁরা একদল ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় গ্রহণ করলেন । এই কেনা বিজ্ঞানীরা 'ইনন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' ও 'ফাইন টিউনিং' নামের অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামে ঈশ্বরের আস্তিত্ব প্রমাণে আদা জল খেয়ে মাঠে নামলেন । কিন্তু ধোপে টিকল না । এরা বি্জ্ঞানের জগতে ঠাঁই পেল না । [২৪] এখন প্রশ্ন হল বৈজ্ঞানিকভাবে বা দার্শনিক কোন পদ্ধতিতে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় ? ভাববাদী দর্শনে এ চেষ্টা নফল হয় নি, যদিও ভুরি ভুরি কথার ফুলঝরি ছেটান হয়েছে । একদল দার্শনিক বলে থাকেন আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুভব করছি, বিশ্বাস করি বা না করি, এটিই ঈশ্বর-স্থিতির প্রমাণ । তাঁরা যুক্তি দেন যে কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে মানুষের চেতনায় বা মনে স্থান পেত না । কিন্তু এ ধরণের কথা দিয়ে বিজ্ঞানমনষ্ক বা যুক্তিবাদী মানুষকে বোঝান শক্ত । এর বিপরীতে রয়েছেন, নিরীশ্বরবাদীরা ছাড়াও, অজ্ঞেয়বাদী ও সংশয়বাদীরা ।

অজ্ঞেয়বাদ কী - এ প্রশ্নের সূত্র ধরে বলা যায় বস্তুবাদী দর্শনে অজ্ঞেয়বাদ হল একটি দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি । এই দর্শন মতে, "বস্তুজাগতিক ঘটনার বাইরে কোন কিছু জানা যায় না, - অর্থাৎ প্রথম কারণ এবং অদৃশ্য জগৎ আমাদের কাছে অজানা (unknown) এবং আপাত দৃষ্টিতে অজ্ঞেয় (unnowable)" । এই মতবাদকে বলা হয়ে থাকে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এবং এর অনুসারীরা হলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) । ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে বলা যেতে পারে ঈশ্বর বা ইহজগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছই জানা অসম্ভব - এ মতবাদকে বলা হয়ে থাকে অজ্ঞেয়বাদ । ঈশ্বর আছেন কি না, পরলোক ও স্বর্গ নরক আছে কিনা – এ ধরণের প্রশ্ন তোলা অবান্তর । সুতরাং আধিভৌতিক জগৎ সম্পর্কে আলোচনা নিরর্থক । কারণ এ সবই ভৌত বাস্তবতার কাঠামোর বাইরের । ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞেবাদীদের বক্তব্য জে জে রামানেস ভাষায় (G J Ramanes) চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, যার সার কথা হল বর্তমানে বিদ্যমান সাক্ষ্যের আলোকে ঈশ্বর নামক সত্তা একটি অজ্ঞেয় সত্তা [২৫] ।

শুধু ঈশ্বর বা পারলৌকিক বিষয় নয়, এমন কি কোন পার্থিব ঘটনাও বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না ঐ ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত নতুন তথ্য অর্জিত হচ্ছে সেটি আমাদের কাছে অজানাই থেকে যাবে । বিজ্ঞান কোন কিছুকেই পরম সত্য বা পরম জ্ঞান বলে মনে করে না, বিনা প্রমাণে ও সাক্ষ্যে বিজ্ঞান কোন কিছুকে গ্রহণও করে না । নতুন নতুন তথ্য আহরণ-সংযোজন, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব পরিশোধন-মার্জিতকরণ – এ ভাবেই বিজ্ঞান অগ্রসর হয় নতুন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় যুক্তি

---

[২৩] এখানে ঈশ্বর শব্দ দিয়ে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর ধারণাকে বোঝান হয় নি । এ শব্দ দিয়ে গড, আল্লঅহ্তালা এবং হিন্দু ধর্মের স্বগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ 'ঈশ্বর্কে বোঝান হয়েছে । এরা সবাই পরম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ঈশ্বর (personal God) ।

[২৪] 'বুদ্ধিদীপ্ত নকসা ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন' - অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ৫১, ২০০৮; 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে কুটকাচালি' - অভিজিৎ রায়, স্বতন্ত্র ভাবনা (অজয় রায় সম্পাদিত), পৃ ১০৭, চারদিক, ঢাকা, ২০০৮; আরও দেখুন, আলো হাতে আঁধারের যাত্রী' – অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনা, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, ২০০৬ ।

[২৫] By agnosticism, I understand a theory of things which abstains from either affirming or denouncing the existence of God; all it undertakes to affirm is that, upon existing evidence, the being God is unknowable. - G J Ramanes

বাদিতা ও মননশীলতাকে আশ্রয় করে। একে যদি কেই 'সংশয়বাদ' বলতে চান বলতে পারেন। সংশয়বাদিতা কি ? সংশংবাদের (skepticism) সাথে যুক্তির নিবিড় সম্পর্ক যেমন রয়েছে বিজ্ঞানের সাথে। তার আগে যুক্তিবাদ (rationalism) কী এ নিয়ে দু'চার কথা বলা যাক। আমার দৃষ্টিতে র‍্যাশনালিজম কোন বিশ্বাস বা ডকট্রিন নয়। এটি হল কারণ (reason), যুক্তি (logic) ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সত্যে উপনীত হওয়ার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (system)। দর্শনে অবশ্য চিরায়ত যুক্তিবাদের আনুষ্ঠাণিক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ

১. `The principle or practice of accepting reason as the only authority in determining one's opinion or course of action.'
২. In philosophy, the theory that the reason or intellect, is the true source of knowledge, rather than sensess.
৩. In theology, the doctrine that rejects that revelation and the supernatural, and makes reason the sole source of knowledge.

সুতরাং যুক্তিবাদের মূলে রয়েছে 'কারণ বা যুক্তি' (reason) ও বুদ্ধিমত্তা (intellect)। সংশয় ও জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা (free inquiry) যুক্তিবাদিতার পশ্চাতে চালক শক্তি। সংশয় ব্যতিরেকে আপাত সত্য বা ঘটনাকে গ্রহণ না করার নীতিকেই বলা হয়েছে সংশয়বাদ এবং এর অনুসারীদের বলায় সংশয়বাদী (skepticist)। সংশয় ব্যতিরেকে কোন কিছু, যা আপাত দৃষ্টিতে যত দুর্বোধ্যই হোক, গ্রহণ করা জন্ম দেয় বিশ্বাসের। আর প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ঠেলে দেয় অন্ধ মূঢ়তার দিকে। কোন ঘটনা সম্পর্কে, তা তথাকথিত দৈবই হোক বা পার্থিব হোক, 'জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন করা' রচনা করে বিশ্লেষণী পদ্ধতির ভিত্তি যা থেকে জন্ম নেয় যুক্তিবাদিতা।

ঈশ্বর বিশ্বাসের দিক থেকে মনুষ্য শ্রেণীকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যার এক প্রান্তে রয়েছে ব্যক্তি ঈশ্বরবাদীরা, অর্থাৎ আস্তিকেরা (theist) এবং অন্য প্রান্তে রয়েছে নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদীরা (atheist)। এর মাঝামাঝিতে অবস্থান করেন অজ্ঞেয়বাদী ও সংশয়বাদীরা। এ ছাড়াও রয়েছেন প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বর বাদীরা (deist) - যারা অতিপ্রাকিত এক বুদ্ধিমত্ত সত্তায় বিশ্বাসী, তবে তিনি এমন এবটি সত্তা যিনি কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টি আর তার পরিচালন নীতি তৈরী করে দিয়ে নিশ্চুপ রয়েছেন, অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না; রয়েছে সর্বেশ্বরবাদীরা (pantheist), যারা অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে প্রকৃতির 'নাতিপ্রাকৃত সমার্থক' শব্দ রূপে (super natural synonym) তাঁরা 'ঈশ্বর' শব্দটি অনেক সময় ব্যবহার করে থাকেন। এক কথায় বলা যায় 'সর্বেশ্বরবাদ হল 'প্রমত্ত নাস্তি কতার' এক কাব্যময় প্রকাশ, আর প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদ হল জল দিয়ে তরলকৃত আস্তিকতা।'

ধর্মে অবিশ্বাসের প্রশ্নে অনেকেই, যেমন পল কার্জ, উগ্র নাস্তিকতার পরিবর্তে সংশয়বাদ শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন সংশয়বাদ শব্দটি 'অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতাবাদের' চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক এবং নির্মল। ঈশ্বরের ওপর আরোপিত নানা অতিন্দ্রীয় গুণাবলী ও তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে ঈশ্বরবাদীরা যে সব তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন তা সংশয়বাদীদের কাছে যথেষ্ট নয়। এ কারণে তারা বলতে পারেন যে বিদ্যমান প্রমাণের প্রেক্ষিতে ঈশ্বর একটি অজানা সত্তা এবং অজ্ঞেয়। এই অর্থে সংশয়বাদী অবশ্যই একজন অজ্ঞেয়বাদী, তবে তফাৎটা হল সংশয়বাদী আলোচনার দরজাটা বন্ধ করে দেন না। আরও নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হোক, তখন ভাবা যাবে।

যেহেতু বিদ্যমান তথ্য প্রমানের সাক্ষ্য অপ্রতুল সে ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে মানা যায় না। নে দৃষ্টিতে দেখলে সংশয়বাদীকে অবশ্যই নাস্তিক বলা যেতে পারে। এখন ঈশ্বর প্রমাণের দায়ভাগ বর্তায় আস্তিক্যবাদীদের ওপর। কিন্তু আমি যদি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করি তা প্রমাণের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। সে দিক থেকে পল কার্জের মতে সংশয়বাদী বলা অনেক নিরাপদ ও প্রাসঙ্গিক। [২৬] এতে প্রমাণিত হয় যে সংশয়বাদ অনুসন্ধান ও গবেষণার ওপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

এখন দেখা যাক পদার্থবিদ্যা কি ইশ্বরের বা অন্য কোন অধিবিদ্যাগত বা অতিন্দ্রীয় সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দিতে পারে কি না। আমাদের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট য়ে, পদার্থবিজ্ঞান এদিক থেকে অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি। আমরা ইতোপূর্বেই দেখিয়েছি যে পদার্থবিদ্যা অজ্ঞেয়বাদের মত কিছু অসম্ভভ্যতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে একটি হল যে কোন ভৌত কাঠামোয় সম্পাদিত ভৌত পরীক্ষণ দিয়ে ভৌত জগতের কোন 'পরম রাশি' নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর ধারণা শুধু পরম সত্তা নয়, ধার্মিকেরা দাবী করেন যে এই সত্তা স্থানকালের সীমায় আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে অন্যকোন মহাবিশ্বের তিনি বাসিন্দা কিনা তা অবশ্য ধর্মবিদরা পরিষ্কার করে বলেন না। কোরানে আল্লহ্‌তালার অবস্থান সম্পর্কে একাধিক আয়াতে উল্লেখ আছে, যেমন সুরা এরাফে বলা হচ্ছে, "আল্লাহ্‌ তোমার প্রভু। তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। পরে তিনি আরশে সমাসীণ হন। .. .. .. " (সুরা সরা এরাফ ৭/৫৪)। আসমান অর্থ আকাশ বা শূন্যস্থান – এখানে হয়তো মহাবিশ্বকে বোঝান হয়েছে। বাংলা একাডেমীর অভিধানে আরশ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সর্বব্যাপী খোদার আসন, বেহেশতের উচ্চতম আসন ...। এই আসনের অবস্থান স্পষ্ট না হলেও তাঁর সৃষ্ট জগতের বাইরে যে অবস্থান তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি ধরা হলে এই আসন আমাদের চেনা মহাবিশ্বের বাইরে বেহেশত নামক কল্পলোকে। সুতরাং আল্লহতালা আমাদের মহাবিশ্বের র‍্যামেনিয় জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলা বক্র স্থানকালের বাইরে। অতএব পদার্থবিদ্যার পরীক্ষনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না, সুতরাং একজন পদার্থদের দৃষ্টিতে তিনি এক অজ্ঞেয় সত্তা।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানের জগতে কী ঈশ্বর বা অতিন্দ্রীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই? এর সহজ উত্তর, না নেই। তবে কোন বিজ্ঞানী ব্যক্তি জীবনে যে কোন ধর্মের অনুসারী হতে পারেন, ঈশ্বরকে পূজো বা আরাধনা করতে পারেন। অবার অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা নিরিশ্বরবাদী। বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 'বিজ্ঞানীর ধর্ম' নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছে আছে। প্রসঙ্গত শুধূ দু'চার কথা বলব।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই হয় প্রকৃতিবাদী, অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী। নিউটন বাববেলীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, নিউটনের সমসাময়িক জার্মান গণিতজ্ঞ দার্শনিক গটফ্রেইড লেইবিনজ(Gottfried Leibniz)ও ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল ধর্মবাদী। নিউটনের বলবিদ্যাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, একে উদ্দেশ্যবাদী নীতি (telelology) দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। [২৭]

---

[২৬] 'কেন আমি সংশয়বাদী' - পল কার্জ, মুক্তান্বেষা, প্রখম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১২, জপনুয়ারী ২০০৮। ইংরেজী প্রবন্ধ ' Why I am Skeptic ' এর বঙ্গানুবাদ; অনুবাদ করেছেন জাহেদ আহমদ

[২৭] The doctrine that the existence of everything in nature can be explained in terms of purpose. এবং এই উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রণাদিত। Baruch Spinoza, *Tractatus Theologico-Politicus*, 1670; Short Treatise on God Man and His well being (English translation: A. Wolf), London, 1910

অন্যদিকে অস্টাদশ শতকের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ ল্যাপলাস ছিলেন ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন, অনেকটা আইনস্টাইনের মতই। শুধু ধর্ম বিশ্বাসে নয় বিজ্ঞানের নীতির ব্যাপারেও তার সাথে আইনস্টাইনের নীতির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

> If men were restricted to collecting facts the sciences were only a sterile nomenclature and he would never have known the great laws of nature. It is in comparing the phenomenon with each other, in seeking to grasp their relationships, that he is led to discover these laws.[২৮]

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে আইনস্টাইনের চিন্তার কি অদ্ভুত মিল।

এরও আগে সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ দার্শনিক-বিজ্ঞানী বারুচ স্পিনোজার (Baruch Spinoza) মতে ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ও অচলা ভক্তিই (Obedience and piety) হল সকল ধর্মের মূল নীতি; ধর্মের বাকী সব কিছুই এ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রচলিত অর্থে স্পিনোজা ধর্মবিশ্বাসী নন- তাঁর ধর্মবিশ্বাস অনেকটা সর্বেশ্বরবাদের (pantheism) অনুরূপ, প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজে পেতেন; সেই অর্থে তাঁর ঈশ্বর হলেন প্রকৃতি-ঈশর (Nature God)। এ কারণেই প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী ও উদারমনা মানুষের তিনি প্রিয়পাত্র। জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে স্পিনোজা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক বা বিজ্ঞানী। নীচের উক্তি থেকেই তার প্রমাণ মেলে ঃ

> Philosophy has no end in view save with truth; faitk looks for nothing but obedience and piety. [২৯]

আইনস্টানীয় বিশ্বাসও স্পিনোজার বিশ্বাসের কাছাকাছি– আর এ কারণেই আইনস্টাইন উক্তি করেছিলেন যে তিনি এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি মানুষের কাজকর্ম বা ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু প্রকৃতির ঐক্যতানের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন।[৩০]

এ কথা অবশ্য মেনে নিতে হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর খ্যতনামা বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকংশই ছিলেন প্রচলিত অর্থে ধর্ম বিশ্বাসী – এই তালিকায় রয়েছেন খ্যাতনামা পরীক্ষণবিদ মাইকেল ফ্যারাডে, তাত্ত্বিক পদার্থদি ক্লাক ম্যাক্সওয়েল, ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম উইলসন, জে জে থমসন (লর্ড কেলভিন), লর্ড রাদারফোর্ড প্রমুখ। সামপ্রতিক কালের কথায় আসা যাক। ১৯৯৮ সালে নেচার কর্তৃক চালিত একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে (ন্যাশনাল একাডেমিক অব সায়েন্সের সদস্য) মাত্র ৭% ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ২০.৮ শতাংশ বিজ্ঞানী নিজেদের অজ্ঞেয়বাদী

---

[২৮] *Exposition du systeme du monde; Pierre-Simon Laplace*, http://www-history:mcs.st-andews.ac.uk/Biograhies/Laplace.html

[২৯] Baruch Spinoza, *Tractatus Theologico-Politicus*, 1670; Short Treatise on God Man and His well being (English translation: A. Wolf), London, 1910

[৩০] I believe in Spinoza's God who reveals himself in the ordinary harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings.

(agnostic) বলে অভিহিত করেছেন। বাকীরা বিপুলভাবে নিরিশ্বরবাদী, অন্ততঃ বাইবেলীয় ঈশ্বরবাদের নিরিখে – অর্থাৎ ৭২.২ শতাংশ সরাসরি নাস্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বস করেন না। [৩১] এ ফলাফলে অবাক হবার কিছু নেই কারণ প্রকৃত বিজ্ঞান সাধকের এ ছারা গত্যন্তর নেই। বিরাশী বছর আগে ১৯১৬ সালে সকল শ্রেনীর বিজ্ঞানীদের (জীববিজ্ঞানী, পদার্থাবদ, গণিতজ্ঞ ..) ওপর চালিত সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছিল যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভিত্তিক ঈশ্বরবাদে (theism) ঈশ্বরে বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল ৪০%। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে এ সংখ্যা যে ক্রমশ হ্রাসমান তা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের সমীক্ষাগুলোতে ধরা পড়েছে। আমাদের কালে প্রখ্যাত কয়েকজন ব্জ্ঞিানী-দার্শনিকদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রতিভূ হলেন রিচার্ড ডকিন্স - যিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানী হতে হলে তাঁকে অবিশ্বাসী হতেই হবে, [৩২] ভিক্টর স্ট্রেংগার [৩৩], সংশয়াদের পল কার্জ এবং ব্যক্তি বাবইবেলীয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মুখপাত্র হয়ে দাড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সরকারী ‘হিউম্যান জেনোম প্রকল্পের’ (Human Genome Project) খ্যাতনামা জীব বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস এস কলিন্স। [৩৪] সাথে পেয়েছেন বেশ ক’জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আর্থার পিকক (Arthur Peacocke)।

কিন্তু ঈশ্বরবাদী কলিন্স নিজে ডারউইনিজমে বিশ্বাসী যখন তিনি বলেন – “ Science reveals that the universe, our own planet, and the life itself are engaged in an evolutionary process. ” এমন কি বিবর্তনের পক্ষে এমন কথাও বলেছেন, “ .. .. in my view evolution might have been God’s elegant plan for creatin humankind. ..”। কলিন্সের মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈপরত্যের ঘটেছে অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। ধর্মবিশ্বাসী হয়েও যে সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী হওয়া যায় কলিন্স তাঁর দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দু’জন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষকের কথা উল্লেখ করতে চাই- যাদের কাছে আমি পদার্থবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে একজন অধ্যাপক সুশীল চন্দ্র বিশ্বাস– যিনি ছিলেন একাধারে নিষ্ঠাবান গবেষক ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তিনি সেই ত্রিশের দশকে রসায়ন পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ছিলেন পথিকৃৎ, ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু নিয়মিত ধ্যান-ধারনা করতেন। অন্যজন আমার প্রিয় শিক্ষক নব্বই উর্দ্ধ অধ্যাপক ইন্নাস আলী, আমাদের দেশের সবচাইতে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত পদার্থবিদ, যার হাত ধরে গবেষণাগারে উচ্চতর গবেষণায় প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু একনিষ্ঠ কোরানিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। নিজের জীবনের অর্জনকে দেখেছেন ঈশ্বরের মহিমাদীপ্ত প্রকাশ হিসেবে, যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন “Revealing the Glory of God in my Life”।[৩৫] কলিন্সের মতই ধর্মবিশ্বাস তাদের বিজ্ঞান সাধানায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি। ভাবতে অবাক লাগে বৈ কি। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোন অর্থবহ অনুশীলন হয়েছে বলে আমার জানা নেই, তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক ঈশ্বর বিশ্বাসী। পরিচিত সহকর্মীদের মধ্যে অবশ্য বেশ য়েকজন রয়েছেন যাঁরা কোন ধরনের ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন না। এখানকার কিছু অপবিজ্ঞানী ‘বিজ্ঞান ও ধর্মের ককটেল’ বানিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে তা বল্গাহীনভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

---

[৩১] E. J. Larson and L. Witham, ‘Leading Scientists still reject God, *Nature*, **394**, 1998, 313

[৩২] Rnchard Dawkins, *The God Delusion,* Bantam Press, Lomdon, 2006

[৩৩] Victor J Strenger, *Has Science found God ? ....*, New York: Prometheus Books, 2003

[৩৪] Francis S. Collins, *The Language of God,* Free Press, New York, 2007

[৩৫] M. Innas Ali, *Revealing the Glory of God in my Life,* Asiatic Civil Military Press, Bangladesh, 1997

একটি গুরুতর প্রশ্নের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার এ প্রবন্ধটির ইতি টানতে চাই। মাস কয়েক আগে আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিক শহীদ অধ্যাপক ড. গোবিন্দ দেবের বৈদান্তিক দর্শন নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে আমন্ত্রনণ জানান হয়েছিল। সমবেত দার্শনিক বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, "ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রোক্ত 'সত্যের' সাথে 'বৈজ্ঞানিক সত্যের' অমিল বা সংঘর্ষ (conflict) বাধলে তখন একজন দার্শনিক হিসেবে আপনার অবস্থান কোথায় হবে ? আপনি কি বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করবেন ?"

বাইবেলীয় বা কোরানের ঈশ্বরবাদীদের কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না, যেমন বাইবেলীয় ঈশ্বরবাদী হেনরি মোরিস দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

When science and the Bible differ, science has obviously misinterpreted its data.[৩৬]

বেশ কয়েকমাস আগে কোন একটি ইন্টারনেট ফোরামে প্রকাশিত " Science and Quran " প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় একাধিক পত্রলেখক মত প্রকাশ করেছেন যে কোরান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে তারা কোরানের মতকেই প্রধান্য দেবে, কারণ বিজ্ঞান শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, অন্য দিকে আল্লাহাতালা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন 'কোন কিছু না' (nothingness)। অজ্ঞানতার কথা বেশ দৃঢ়তার সাথে প্রচার করতে আমরা মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হই না।[৩৭] এই হল আমাদের বিজ্ঞান সাধানার পরিনতি।

০০০০ ০০০০ ০০০০

পরিশিষ্ট ১

অসঙ্গ ও নাগার্জুনের ভাববাদী দর্শন

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা বিজ্ঞান বলতে বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরানুভূতি সম্পর্কে যে তত্ত্বজ্ঞান– বিশেষ জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান তাই হল বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা যে অর্থে বিজ্ঞান বুঝেচেন তা হল ভাববাদী চরম বা পরম জ্ঞানকে। বেদান্ত বাদীদের মতে এই জ্ঞান হল 'ব্রক্ষজ্ঞান'। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে হাতে বিজ্ঞান দর্শন গড়ে উঠেছে তার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' যার সাথে বেদান্তবাদীর দেখার পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে আমাদের কাছে যে দৃশ্যমান বস্তু তা মনোজগতে সৃষ্ট একটি ভাব মাত্র এর বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব নেই। হীনযানীদের দর্শন চিন্তায় বলা হয়েছে 'বস্তুর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববোধই হল জ্ঞান', পরবর্তী ধাপে আর একটু এগিয়ে বলা হয়েছে যে 'ধারণার মধ্য দিয়ে সত্যের বোধ লাভ করা যায়'। এর ফলে ভাববাদের দিকে বৌদ্ধ দর্শন আরও এগিয়ে গিয়ে মন ও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের কুয়াশা বা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি করেছে, কিছুটা মিস্টিক বা রহস্যবাদেরও। অন্যদিকে মহাযানী দার্শনিকেরা এই পথে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন 'আমরা যে বস্তু সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করি তা হল ভাব থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিলিপি (replica), যার পশ্চাতে বস্তুর কোন প্রকৃত বা বাহ্য অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না।' অন্যভাবে বলা হয়েছে, 'বাহ্য জগৎ বলে কিছু নেই, যা

---

[৩৬] H. R. Moris, *The Long War Against God*, New York: Master Books, 2000

[৩৭] শূন্য থেকে কী ভাবে প্রকৃতিতে জড়ের সৃষ্টি হয় তা জানতে হলে দেখুন, '*আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*', পৃ ৯১ - ৯৬, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও নংশোধিত সংস্করণ, ২০০৬। এছারা দেখুন, " *Has Science Found God* ...., by Victor J Stenger, Prometheus Books, 2003 "

আছে তা মনোজগৎ মানুষের মস্তিষ্কে যার স্থিতি ।' সকল অভিজ্ঞাতাকে বলা হয়েছে 'মনের মধ্যে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধারণা মাত্র' । এই হল বিজ্ঞানবাদীদের মূল কথা ।

বিজ্ঞানবাদের মূল প্রবক্তা অসঙ্গ হলেও এই দর্শনকে পরিপক্ক করে তুলেছেন বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত প্রমূখ । অসঙ্গের মতে আমাদের জ্ঞানের অবলম্বন বা উপাত্ত যদি বর্হিবস্তু থেকে আসে, তাহলে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে সেই ছাপটি (impression) ও বর্হিবস্তু এক হতে পারে না । এই ছাপটি তো বর্হিবস্তুর প্রতীক মাত্র । মনোজগতে সৃষ্ট এই ছাপ থেকে বাহ্যজগতের অস্তিত্বের কথা যে অমরা বলি তা শুধু কল্পনা । আর যদি সত্যি সত্যিই বর্হিজগতের অস্তিত্ব থাকে তা আমাদের জানবার উপায় নেই । যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে আমাদের মনোজগতে যে ভাব বা ছাপের সৃষ্টি হয় তার পশ্চাতে কোন একটি হেতু)তো থাকা চাই, তার উত্তরে অসঙ্গবাদীরা বলে থাকেন বর্হিবস্তুই যে ঐ হেতু বা কারণ হতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই । তাদের মতে বস্তু সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ধারণা বা কনসেপ্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে তা আসলে কতকগুলি ভাবসমষ্টি । জিনিস মানে সংবেদনগুচ্ছ । চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ যা কিছুর উৎপত্তি হয় তা ক্ষণিক । অসঙ্গের মতে সারা বিশ্বই বুদ্ধিময়, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন – ভাবের সঙ্গে, বর্হিবস্তুর অস্তিত্বেরও কোনও প্রয়োজন আমাদের হয় না । বস্তুর যে ধর্ম – দৈর্ঘ, প্রস্থ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি সমস্তই ব্যক্তি নির্ভর বা বিষয়ী-আশ্রিত । বিজ্ঞানবাদীরা আরও চরম কথা বলেন– 'চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি তথাকথিত বাহ্যবস্তুগুলি আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতা মাত্র । বর্হিবস্তু কেবল কথার কথা, আমাদের চারদিকে যে ঘটনা ঘটে সেগুলো শুধু আমাদের মনের সৃষ্টি । এক সুপ্রতিষ্ঠিত মানসিক শৃঙ্খলা থেকে সেগুলোর অভ্যুদয় । অসঙ্গের এসব ভাববাদী তত্ত্বকথা পরবর্তীকালে বার্কলে ও ফিকটের দর্শনেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় ।

বসুবন্ধ বলেছেন যে, যেহেতু বর্হিবস্তুর মনের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই, তাই কনাদের মতানুসারে স্থুল বস্তু যে পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এ ধারণাও বিজ্ঞানবাদীদের দৃষ্টিতে বাতিল হয়ে যায় এবং পরমাণুরও কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না । শান্তরক্ষিতের মতে পরমাণু এক আকাশকুসুম কল্পনা । বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে 'বিজ্ঞানের দুটি ক্রিয়া, একটি উপলব্ধি আর একটি ব্যাখ্যা' । এই উপলব্ধি ও ব্যখ্যার মধ্যদিয়ে অভিজ্ঞতার জ্ঞানও গড়ে ওঠে । জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে এই কথাটিই আমরা সঠিকভাবে জানি । সমগ্র বিশ্বই বিজ্ঞান বা বুদ্ধি – সকল বস্তুই বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত । চিন্তার বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই । চিন্তাই জ্ঞানের আদি ও জ্ঞানের শেষ ।

বুদ্ধ বলতেন জড়জগতের যে দুঃখ-বেদনা, ক্লান্তি-বিষাদ, জড়া-মৃত্যু-অসুস্থতা– এ সবকে অতিক্রম করে মনের এক অনির্বচনীয় মুক্তির স্তরে উপনীত হওয়ারই অপর নাম 'নির্বাণ' বা মুক্তি । এ কোন ব্রহ্মজ্ঞানও নয়, পরমব্রহ্মে মিলিয়ে যাওয়াও নয়, ঈশ্বরপ্রাপ্তিও নয় । বিজ্ঞানবাদীরা নির্বাণের বিশদ ব্যখ্যা দিয়েছেন; তাদের মতে 'নির্বাণ' চার প্রকার । প্রত্যেক জীবের যে শুদ্ধ পবিত্র আদি রূপ তার নাম ধর্মকার, এই ধর্মকার এক ধরনের 'নির্বাণ' । সকল দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়েও যখন পর্যন্ত কিছুটা জড়ের বন্ধন থাকে তাকে উপাধিশেষ 'নির্বাণ' বলা হয় । অনুপাধিশেষ নির্বাণে জীবের সমস্ত শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যায় । সকলের শেষ 'নির্বাণ' যখন আলোকপ্রাপ্ত হয়, বিশ্বের মঙ্গলই তার বিষয় হয় তখন 'নির্বাণ' তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায় ।

আর এই দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী রূপ হল প্রথম খ্রীস্টাব্দে বিকশিত বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুনের সাপেক্ষবাদের ও অবচেতন সত্তার ধারণা যার ওপর ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর দর্শন পদ্ধতি যাকে বলা হয়ে থাকে 'মাধ্যমিক বা মধ্যপথ' । পরে তা শূন্যবাদ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে । এই দর্শনের মূল কথাগুলো হচ্ছে – 'মন ধারণায় বিশিষ্ট হয়, ফলে তখন থাকে কেবল কতকগুলো অসংহত ধারনা ও উপলব্ধি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না । তাহলে আমরা পৌঁছে যাই এমন কিছুতে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন কিছু যা আমাদের সীমাবদ্ধ মনের অগম্য, আমরা প্রকাশ করতে পারি না, যার সংজ্ঞা দিতে পারি না । তাঁর যুক্তি প্রক্রিয়া এভাবে অগ্রসর হয় – বর্হিজগতের যদি অস্তিত্ব না থকে তাহলে মনোজগতের যে অস্তিত্ব আছে তারই বা প্রমাণ কোথায়? আমাদের মনের বাইরে বর্হিবস্তু যদি না থাকে তাহলে উপলব্ধির বাইরে আত্ম-চেতনাই যে আছে এমন মনে করার মতো কিছু নাই । দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অনুভব, ইচ্ছাশক্তি .. .. ব্যতীত বিজ্ঞান বা বুদ্ধির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না । যদি বিষয় না থাকে তাহলে বিষয়ীও নেই । বিষয়গত সম্বন্ধ না থাকলে জগতও থাকে না । সুতরাং নাগার্জুনের মতে বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ উভয়ই শূন্য (void) ।

তাঁর যুক্তি মতে জগৎ বাস্তব হলে তার কখনও পরিবর্তন সম্ভব হতো না, আবার জগৎ যদি কেবল ভাবের সমষ্টি হয় তাহলেও তার উন্নতি ও প্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল বৌদ্ধ দর্শন মতে জগৎ প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তনশীল ভব-উন্মুখ – ডাই-ইলেক্টিক্যাল পথ ধরে। তিনি মনে করতেন যে জগতের সকল পদার্থ সৎও নয়, অসৎও নয়, সত ও অসৎ এই উভয় প্রকার নয়, পৃথকও নয়, অনাগমও নয়, অনির্গমও নয়। মাধ্যমিক সূত্রে বলা হয়েছে, "জিনিস ক্ষণিকও নয়, অনন্তও নয়, সমুৎপদও নয়, উচ্ছেদও নয়, অভিন্নও নয়, পৃথকও নয়, অনাগমও নয়, অনির্গমও নয়। ক্রমবিকাশের পদ্ধতিরূপে জগতের কোনও চরম বাস্তবতা নেই। বস্তু যদি বাহ্য হত তাহলে তার উদয় ও বিকাশ থাকত না। শকট যেমন কতকগুলো বাস্তব ধর্মের সমষ্টি, মানুষও তেমনি কতকগুলো বাস্তব ও মানসিক ধর্মের সমষ্টি। ধর্ম ছাড়াও শকট ও মানুষের প্রজ্ঞপ্তি [৩৮] আছে। এক অনন্ত ধারাবাহিক শ্রেণীতে এই ধর্ম কতকগুলো ক্ষণিক বা মুহূর্ত বিশেষ। চিন্তার কিছু বাহ্য হেতু থাকতে পারে তবে চিন্তার আসল হেতু হল পূর্ববর্তী চিন্তা। প্রদীপের শিখার স্থায়িত্বের প্রতি মুহূর্ত, তেল ও পলতের ওপর নির্ভর করলেও, আসলে তা শিখার পূর্বমুহূর্তের ধারাবাহিকতা। জগতে স্বয়ম্ভু বলে কিছু নেই। সবই অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। নাগার্জুন বলেছেন "ইহ প্রতীত্যসমুৎপদ শূন্যতম প্রচক্ষতে।" [৩৯] অর্থাৎ এই প্রতীত্য সমুৎপাদকেই শূন্যতা বলে। জন্ম নয়, মৃত্যু নয়, সত্তা নয়, বিলুপ্তি নয়, এক নয়, বহু নয়, আসা নাই, যাওয়া নাই – এই হচ্ছে শূন্যতা। ॥

নাগার্জুনের মতে বর্হিবস্তু অবোধ্য তাই বর্হিবস্তু অবাস্তব, বিজ্ঞানও অবোধ্য সেইজন্য বিজ্ঞানও অবাস্তব। এ জগৎ শুধু সম্বন্ধ। সম্বন্ধের জটিলতাকেই আমরা জগৎ বলি। এই সম্বন্ধগুলো দুর্বোধ্য। আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার জগৎ শুধু আভাস – কতকগুলো দুর্বোধ্য সম্বন্ধের সমষ্টি। বস্তু ও চৈতন্য, দেশ ও কাল, কারণ ও কার্য, গতি ও স্থিতি সবই ভিত্তিহীন স্বপ্ন, এদের পেছনে কণামাত্র বাস্তবতা নেই। এই পণ্ডিতপ্রবরের মতে আলো ও অন্ধকার যেমন যুগপৎ থাকতে পারে না তেমনি অসংস্কৃত ও সংস্কৃত বস্তু একসাথে থাকতে পারে না। সংস্কৃত বস্তু অবাস্তব। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ধারণা বুদ্ধির অগম্য। অতীত সন্দেহজনক, ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট। বর্তমানকেই কতকটা সত্য বলে মনে হয়। অতীত ও ভাবষ্যত না থাকলে বর্তমান অর্থহীন হয়ে পড়ে। যার আদি নাই, অন্ত নাই তার মধ্যদেশ থাকা কী ভাবে সম্ভব ? শুন্য থেকে চিন্তার আকার রূপে কালের উৎপত্তি। নাগার্জুনের এসব ভাববাদী তত্ত্বকথা আমদের কান্টের কথা মন করিয়ে দেয়।

আমরা বস্তুকে তার গুণ দিয়ে জানি। গুণের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ বস্তু তাহলে গুণহীন হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল এই গুণগুলোর অস্তিত্ব কোথায় ? গুণহীন বস্তু যেমন অনুধেয় নয়, তেমনি বস্তুহীণ গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সেজন্য একবার বস্তু থেকে গুণে আবার গুণ থেকে বস্তুতে টানাপোড়েন করি অথচ বস্তু ও গুণ এক না পৃথক তা আমরা জানতে পারি না। বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, কোমলত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতি গুণ বিষয়ী আশ্রিত। ইন্দ্রিয় আছে বলেই সেগুলোর অস্তিত্ব, চক্ষু ছাড়া বর্ণ, কর্ণ ছাড়া শব্দের অস্তিত্ব নেই। গুণের নিজের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই আভাস। কাজেই যে বস্তুকে আশ্রয় করে গুণের প্রকাশ তা বাস্তব হতে পারে না। মোদ্দা কথা দঁড়াচ্ছে বস্তু ও গুণ পরস্পর সম্পর্কিত কোনটিই সমগ্রভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। যার অস্তিত্ব আছে তা বস্তুও নয় গুণও নয়। যাতে গুণ আছে তাকে বস্তু বলে আমরা অভিজ্ঞতায় মেনে নিলেও আসলে বস্তু বলে কিছু নেই। এই হল নাগার্জুন দর্শন শূন্যবাদের সার কথা।

নাগার্জুন বলেছেন, "জ্ঞানের কোনও প্রকৃত ব্যখ্যা দেয়া যায় না। সংবেদনা থেকে যেমন ভাব আসে, তেমনি আবার ভাব থেকে সংবেদনার উৎপত্তি হতে পারে। দর্শনেন্দ্রিয় দেখে না, আবার যা দর্শনের ইন্দ্রিয় নয় তাও দেখে না, তাহলে কে ও কী দর্শন করে ? কাজেই দর্শক, দর্শন, এবং দর্শনীয় অচিন্তনীয় ব্যপার হয়ে দঁড়াচ্ছে। উপলব্ধি ও উপলব্ধ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী। নাগার্জুন আপেক্ষিতার ওপর জোর দিয়েছেন– যেমন বলতেন আকার ছাড়া যেমন কলসের অস্তিত্ব নেই, তেমনি কলস ছাড়া আকারের অস্তিত্ব অভাবনীয়। কাজেই সমস্ত জিনিসই আপেক্ষিক। তেমনি দ্রব্যের বা বস্তুর সকল ধর্ম আপেক্ষিক, চরম বা পরম বলে কিছু নেই।

শূন্যতা বোঝাতে নাগার্জুন প্রাণপাত করেছেন, তাও তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। বুদ্ধের চরম সত্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি শূন্য বোঝাতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের চরম যে সত্য তা শূন্য নয়, অশূন্য নয়, শূন্য অশূন্য

[৩৮] প্রজ্ঞপ্তি অর্থ হল বিজ্ঞাপন। বিশেষভাবে জ্ঞাতকরণ বা নিবেদন। এখানে বলা হচ্ছে যে স্বভাবিক ধর্ম ছাড়াও শকট বা মানুষের নিজেকে জাহির করার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য গুণাবলী থাকতে পারে।

[৩৯] '*প্রতীত্যসমুৎপদ*' অর্থ হল 'কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে অপর বস্তুর উৎপাদন বা উদ্ভব।'

উভয় নয়, শূন্য অশূন্য থেকে পৃথক নয়, সেই চরম সত্যকে চিহ্নিত করার জন্যই শূন্যতা বলা হয়। আবার অন্যত্র বলছেন ‘শূন্যতা দ্বারা সবই সম্ভব হয়, শূন্যতা ব্যতীত কিছুই সম্ভব হয় না’। জগতের একমাত্র তত্ত্ব শূন্যতা। শূন্যতার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নেই, তা দেখাও যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না। নাগার্জুন শূন্যতা সম্পর্কে যে পরম জ্ঞান তাকেই নির্বাণ বলেছেন। শূন্যতার যে জ্ঞান তা হচ্ছে পরমার্থ বা পরম জ্ঞান। মাধ্যমিক কারিকাতে বল হয়েছে, ‘বুদ্ধের ধর্মে দুটি সত্য আছে। একটি লৌকিক বুদ্ধি রূপ সংবৃতি আর একটি শূন্যরূপ পরম সত্য।’ নাগার্জুনের উক্তিসমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় তিনি একটি গোলক ধাঁধায় পতিত হয়েছেন যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বেদান্তবাদীরাও তো প্রকারান্তারে একই কথা বলে থাকেন পরম ব্রহ্মই হল শ্বাশ্বত বা পরম জ্ঞান। জীব যখন এই জ্ঞান লাভ করে তখন তার মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু এই ব্রহ্ম বোঝাতে বেদান্তবাদীর গলদঘর্ম হলেও সফল হন না। অবশেষে হাল ছেরে দিয়ে বলেন ‘ব্রহ্ম কী তা উপলব্ধির বিষয়’ জ্ঞান দ্বারা তাকে জানা যায় না।

নাগার্জুন শূন্যবাদে পৌঁছাতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা হল সংশ্লেষণ মূলক যুক্তি। তাই তিনি কেবল সম্পর্কই দেখেছেন, বস্তু দেখেন নি। কেবল প্রবাহ দেখেছেন, ঘটনা দেখেন নি। ফলে এই সংশেষণ মূলক যুক্তি তাকে টেনে নিয়ে গেছে অন্তহীন এক গোলক বৃত্তে। সেখানে তিনি উপনীত হয়েছেন অন্ধের মত। সংশেষণ ও বিশেষণ পদ্ধতি যদি আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগ করা হয় তা প্রায় ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী ও অন্ধ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। নাগার্জুনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এই একদেশদর্শী অন্ধ সংশেষণ যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি এক বিরাট গহ্বরে পতিত হয়েছেন। শুধুমাত্র সংশেষণ মূলক যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি বুদ্ধের মৌলিক ডাইলেকটিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। বুদ্ধ স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘প্রত্যেক জিনিস সেই জিনিসও বটে অবার সেই জিনিস নয়ও বটে’। তিনি এই পথ পরিহার করে কেবল বস্তুর বাহ্যিক সম্বন্ধ দেখেছেন বস্তুর আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ দেখেন নি, ফলে বস্তুর আভ্যন্তরিক পরিবর্তন – জগতের ক্রমবিকাশ তার কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে। নাগার্জুনের দর্শন আপেক্ষিকবাদ ও সন্দেহবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। নাগার্জুনের দর্শন চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় হিউম ও বার্গসোঁর চিন্তাধারায়।

পরিশিষ্ট ২

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য-পথ নিয়ে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত চিত্র ঃ

- সকল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সমন্বিত করা এবং একটি যৌক্তিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা। আমাদের ধারণাগুলোর যাথার্থ্য কেবল এরা আমাদের অভিজ্ঞতার জটিলতাকে সংক্ষেপে বিধৃত করে মাত্র, এর বাইরে এদের কোন বৈধতা নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ে দার্শনিকদের অযথা হস্তক্ষেপকে আইনস্টাইন সমালোচনা করেছেন– তিনি মনে করেন তাঁরা বিজ্ঞান-চিন্তার অগ্রগতিতে অনেক সময়ই বাধার সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্র থেকে কতিপয় মৌলিক ধারণাকে, যেগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল, ঝেঁটিযে বিদায় করে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) নামক অবোধ্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

  যদি মনেও হয় যে, ভাবের বিশ্বকে (Universe of Ideas) যৌক্তিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা থেকে নির্মাণ করা যায় না, কিন্তু এটি তো ঠিক যে এই বিশ্ব হল মনুষ্য মননের সৃষ্টি, যা ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু তথাপি, ‘ভাবময় বিশ্ব’ আমাদের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি থেকে ততটুকুই স্বাধীন, যতটা পরিধেয় বস্ত্র মানবদেহের আকার থেকে স্বাধীন। এটি বিশেষভাবে সত্য আমাদের স্থান ও কাল সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে, যে দুটি সত্তাকে পদার্থবিদরা তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) রূপ সৌধের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছে তাদেরকে সঠিক প্রেক্ষিতে সুবিন্যস্ত করতে এবং এদেরকে কার্যাপোযোগী অবস্থায় (serviceable condition) দাঁড় করাতে।[৪০]
- যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো হলো “মনুষ্য মনের মুক্ত সৃজন”[৪১], তবে এদের অর্থ ও যথার্থতা দায়বদ্ধ হয়ে আছে ইন্দ্রিয়ানুভূত ছাপগুলোর সামগ্রিকতার কাছে – যার সাথে এরা

---

[৪০] কান্টের মতে স্থান ও কাল মানব মনে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট সত্তা (*a priori concept*) রূপে প্রোথিত। কান্টীয় দর্শন অনুসারে ঃ ‘Space and Time are Empirically Real. But Transcedentally Ideal.’ আইনস্টাইনের বক্তব্যের জন্য দেখা যেতে পারে : Albert Einstein, *The Meaning of Relativity*, Princeton Lecture, 1921

[৪১] Albert Einstein, `On Physical Reality’ in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936

সুসমন্বিত এবং যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে বা স্বজ্ঞাতভাবে সম্পর্কিত। একটি 'প্রকৃত বস্তুকে' তুলে ধরা যায় একমাত্র এই কারণে যে, এই ধারণাগুলোর এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা হয়তো ইন্দ্রিয়ানুভুত 'সংবেদনগুলোর গোলকধাঁধার' (labyrinth of sense impressions) রহস্য নিরসনের পথ খুঁজে পেতে পারি। তাহলে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রসূত 'প্রাথমিক' ধারণা, মনুষ্য মেধা সৃজিত ধারণা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনকারী নিয়মসমূহ, যারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ করে, একত্রে হল 'মুক্ত উদ্ভাবন'।
প্রশ্ন হল এমন কি কোন নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার সাথে সঙ্গতি রেখে ধারণাগুলোর সাথে সংবেদনগুলোর একটি সুসমন্বয়ী নির্বাচন সম্পাদন করা যেতে পারে। এডিংটনের মত বিয়য়াশ্রিত দার্শনিক বিজ্ঞানী হয়তো বলতেন 'অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে', কিনতু আইনস্টাইনের উত্তর খুব সম্ভব হবে সুনির্দ্দিষ্ট 'না', কারণ আইনস্টান বাববার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে 'ধারণা' নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা থেকে উদিত হয় না।

বিজ্ঞানীর মেধার 'মুক্ত উদ্ঘাটনের' ওপর গুরুত্ব দিলেও বৈজএ্রানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকার কথা তিনি ভুলে যা নি; একই সাথে পরপরই তিনি বলেছেন, " Experince may suggest the appropriate mathematical concepts, but they most certainly cannot be deduced from it."

- আরও বলেছেন যে, ' কোন গাণিতিক গড়নের ভৌত উপযোগিতার একমাত্র নির্ণায়ক এখনও অবশ্য অভিজ্ঞতা; কিন্তু সৃজনশীল নীতি রয়েছে গণিতের মধ্যেই। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে .. .. আমি সত্যি বলে মনে করি যে বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবতাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি, যা আমাদের প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন।' (.. .. I hold it true that pure thought can grasp reality, as the ancient dreamed)। আইনস্টাইন কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা শূন্যবাদী নাগার্জুনের মত বস্তু'কে কেবল মনোজগতের সৃষ্টি বলে মনে করতেন না, আমাদের পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ ভৌতবাস্তবাতার অস্তিত্বই হল তার বিজ্ঞান সাধনার ভিত্তি, এবং এই ভৌত বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে– সেই ইন্দ্রিয়ানুভূত সংবেদন যতই আদিম বলে মনে হোক। এ কারণেই আইনস্টাইন কখনও পর্যবেক্ষণের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি, এবং মনুষ্যমেধার সৃষ্ট তত্ত্বকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশেষ বা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব যদি পরীক্ষার কষ্টিপাথরে না টিকত তাহলে আইনস্টাইনের সকল তত্ত্ব যতই সার্বজনীন, সুন্দর, বিমোহিত এবং মনুষ্যমেধার চমকপ্রদ উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে প্রতিভাত হোক না কেন, অধিবৈদ্যিক দর্শনের কোলে আশ্রয় নিত, বিজ্ঞানে উন্নীত হত না। এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ 'একটি গাণিতিক নির্মাণের ভৌত উপযেগিতার ক্ষেত্রে – অভিজ্ঞতা, অবশ্য এখন অবধি, একমাত্র নির্ণায়ক। কিন্তু সৃজনশীল নীতি গণিতেই অবস্থান করে।'[৪২] এ প্রসঙ্গে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে বিজ্ঞানীরা একটি সার্বজনীন নীতি গ্রহণ করেছেন তাহল বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলোর মধ্যে সমপর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে কেবল বিদ্যমান জ্ঞাত ঘটনাবলীরই ব্যখ্যা দান নয়, এ থেকে ভবিষ্যত ঘটনারও নিশ্চয়তার সাথে আভাস দেওয়া সম্ভব। আমাদের অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে বিজ্ঞান কেবল উপযোগী প্রকৌশল নয় বা ভবিষ্যতবক্তা নয়, এটি একটি যন্ত্রব্যবস্থাও বটে যার মাধ্যমে আমরা সুশৃঙ্খল, অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত, অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাইকৃত বাস্তবতার ধারণাগুলোকে অর্জন করতে পারি।
- তত্ত্বীয় পদার্থক্ষদ্যার অভাবনীয় সাফল্য দেখে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, বিজ্ঞানীদের স্ব-উদ্ভাবনী পন্থা (heuristic method), অর্থাৎ গাণিতিক সারল্য ও সৌন্দর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা, চমৎকার সার্থক তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। এবং এই সব তত্ত্ব অভিজ্ঞতার আলোকে 'সত্য' হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের পন্থায় প্রাপ্ত সত্যকে অনেকেই বলেছেন 'কঠিন সত্য', আবার অনেকে অভিহিত করেছেন মূলত 'অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য' (empirical fact)। এ ধরণের আবেগময় প্রতিক্রিয়া নানা বৈচিত্রের হতে পারে, যেমন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর কাছে মনে হতে পারে এক ধরণের 'মরমী অভিজ্ঞতা' (mystic experience)। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে জগৎ বোধ্য, আর এটি হল সবচাইতে অবাক করা কাণ্ড। [৪৩]

---

৪২ Experience remains, of course, the sole criterion of the physical utility of a mathematical construction. But the creative principle resides in mathematics. *Ibid.*

৪৩ 'The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.', Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936

- তবে এটিও সত্য অনেক বিজ্ঞানীই উপরে যা বলা হল তার সাথে একমত নন। প্রকৃতিতে সরল নিয়মের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান (P. W. Bridgman) মত ব্যক্ত করেছেন যে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছেঃ প্রথমত, সম্ভবত সরল নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে যা এখনও অনাবিষ্কৃত; অন্যটি হল যে প্রকৃতির সরল নিয়মের প্রতি রয়েছে পক্ষপাতিত্ব বা অনুরাগ। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, পার্থক্য কেবল উপস্থাপনা শৈলীতে। আমরা যখন 'সরল' বলি তখন বোঝাতে চেষ্টা করি আমাদের ধারণার মাধ্যমে সরল রূপে প্রতীয়মান হওয়া। বাস্তবিক অর্থে আমাদের ধারণাগুলো কিন্তু সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট নয়, বরং এরা ধোঁয়াশে এবং সঠিকভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না। এতদ সত্তেও কিছু সীমিত পরিধিতে বেশ কিছু সরল নিয়ম দেখা যায় এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক।[৪৪]
- অন্যদিকে আইনস্টাইন ভৌত তত্ত্বের সরলতা এবং তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতীক সমূহের চমৎকার সৌন্দর্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, যার মধ্য দিয়ে ভৌত বাস্তবতা আমাদের কাছে ধরা দেয় (nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas)। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ম্যাক্সওয়েলের অনুপম সমীকরণসমূহের কথা অথবা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর চমৎকারিত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সৌন্দর্য অনেক বিজ্ঞানীর মনে সঞ্চার করে প্রশংসা, অনেকের মনে শ্রদ্ধাময় ভক্তি; অন্যদিকে প্রকৃতিতে এত সরল নিয়মের অস্তিত্ব ব্রিজম্যানের কাছে উদয় হয় আশ্চর্যবোধ রূপে। দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা অবশ্য ভৌত জগৎ বা যৌক্তিক পদ্ধতি – য-দ্বারা বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বর্ণনা দেয়া হয়, সম্পর্কে ভিন্নদৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবাহী নয়। এই পার্থক্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত পদার্থবিজ্ঞানেরও বড় সমস্যা হল ইন্দ্রিয়ানুভুত অভিজ্ঞতাজাত জগৎ এবং ধারণা ও প্রতিজ্ঞার (propositions) মধ্যদিয়ে সৃষ্ট জগতের মধ্যে আপাত সমুদ্রসম ব্যবধানের মধ্যে কী ভাবে সেতুবন্ধ রচনা করা সম্ভব ? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি উপাংশ রয়েছে – একটি হল দৃষ্টবাদ-সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আসা এবং সুনির্দিষ্টভাবে তাৎক্ষণিক, আর অন্যটি হল কল্পনার মধ্য দিয়ে ও তত্ত্বীয়ভাবে সৃষ্ট। শেষোক্ত জ্ঞানের চরিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তাৎক্ষণিক জ্ঞান থেকে বেশ স্বতন্ত্র। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিলে, বিশেষ করে তত্ত্বের আধেয় এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সামগ্রিকতার মধ্যে সম্পর্কগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবেশ করলে, দেখা যায় যে আমরা জ্ঞানের দুটি আপাত অ-পৃথকযোগ্য উপাংশের মুখোমুখী হয়েছি ঃ (ক). অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং (খ). যুক্তিসিদ্ধ (rational) জ্ঞান। আইনস্টাইনের মতে, বিশুদ্ধ যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। তিনি একটি চমৎকার উক্তি করেছেন ঃ All knowledge of reality starts from experience and ends in it.
- কেবলমাত্র বিশুদ্ধ যৌক্তিক উপায়ে অর্জিত প্রতিজ্ঞাসমূহ বাস্তবতার সাপেক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফাঁপা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে রয়েছে স্বীকার্যভিত্তিক নামাঙ্কিত, অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত উপাংশ এবং আরোহনের মাধ্যমে প্রদত্ত, সুচিহ্নিত, অভিজ্ঞতালব্ধ উপাংশ। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছেন যে আমরা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ হেতু (reason) বা বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা আরোপ করেছি। পদ্ধতিটির গড়ন হল হেতু বা বিচারবুদ্ধির কাজ; অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপাংশগুলো এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো অবশ্যই তত্ত্বটির সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে এভাবে অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত তাত্ত্বিক উপাংশটি হল 'মনুষ্য মেধার মুক্ত উদ্ভাবন'। যেহেতু তত্ত্বীয় উপাংশটি অভিজ্ঞতা থেকে সরসরি আহরণ করা যায় না, তাই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা নিজস্ব কিছু অবদান প্রর্কতির ও বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক ধারণাতে রাখতে পারে। এর অর্থ হল বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে দৃষ্টবাদের কোন স্থান নেই কারন দৃষ্টবাদী তত্ত্বানুসারে সকল তত্ত্বীয় তাৎপর্য আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্ঞানতত্ত্বে এর একটি গুঢ় তাৎপর্য রয়েছে কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের বিষয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, শুধু মাত্র বিষয়াশ্রিত গড়নের (subjective construct) জ্ঞান নয় – যা নব্য কান্টবাদী জ্ঞানীদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত। এই সিদ্ধান্ত থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তা হল বস্তুর স্ব-সত্তা'কে (thing in itself) বৈজ্ঞানিক পন্থায় জানা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেই বস্তুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি; যেমন একঝাক ইলেকট্রনের ওপর গবেষণাগারে নানা ধরনের পরক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি –

[৪৪] ব্রিজম্যানের অভিমত সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য – P W Bridgman, *The Logic of Modern Physics*, 2nd Edition, New York, 1946, 201-3

টিভিতে ছবি উৎপাদনে ব্যবহার করি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে 'আলোক বীম' হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এবং দৈনন্দিন জীবনে ধাতব তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ শাক্তি উৎপাদন করি। সুতরাং বিজ্ঞান দাবী করতে পারে যে সে তত্ত্ববিদ্যাকে (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্বকে (epistemology) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মর্যাদায় পুর্নস্থাপন করেছে।

- আইনস্টাইনের মতে আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাপ্রসূত বর্হিজগতের ধারণাগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূত ছাপের (sense impression) ওপর; আর পদার্থবিদ্য অনুশীলন করে ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে এবং এদের মধ্যে "বোধদায়ী" (comprehending) সম্পর্কগুলো নিয়ে। বিজ্ঞানে এই সেতুবন্ধের চেষ্টা কী ভাবে করা হয় তা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। কান্ট তার জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কী ভাবে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জগতের সাথে বুদ্ধিমত্তায় সৃষ্ট জগতের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন 'অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতা' (empirical realism) ও 'তুরীয় ভাববাদ' (transcendental idealism) নামক দুটি সত্তার (entity) মধ্য দিয়ে সে সম্পর্কে বিদগ্ধ জন অবগত আছেন। তাই আমি সে প্রসঙ্গে যাব না। কান্টের দর্শনে বলা হয়েছে যে প্রকৃতির নিয়ম হল প্রকৃতির অভিজ্ঞতার নিয়ম। তিনি মনে করেন যে চিন্তার নিয়ম ও চিন্তার সংশ্লেষী একত্বের নীতির মধ্যে ঐকতান বিদ্যমান। আমাদের বুদ্ধিবৃদ্ধিক কৌশলে রয়েছে সংজ্ঞা, স্থান ও কালের রূপরেখা এবং বিশুদ্ধ বোধগম্যতার নীতিমালা। দুটিই 'জ্ঞানের' উপাদান তবে তা অভিজ্ঞতাপ্রসুত বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যদিও সবটাই অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত নয়। এ উপাদানগুলো পূর্ব নির্ধারিত (a priori); কিন্তু কান্টের 'পূর্ব নির্ধারিত' তো কালিক নয় যার সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক রয়েছে – এটি হল যৌক্তিক অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ 'পূর্ব নির্ধারিত'। [৪৫]
- আইনস্টাইন লিখেছেন: " আমাদের 'ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতা' গুলোকে (sense experience) যে চিন্তনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলিত করা যায়– এটি সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু তা কখনও বোঝা যাবে না।" [৪৬] এই প্রক্রিয়ায় কোন পূর্ব নির্দ্দিষ্ট কাঠামো (a priori framwwork) নেই, এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাগুলোকে সাথে ধারণাগুলোর বা তাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্বয়ের কোন পরবর্তী (posteriori) কাঠামোও স্থাপন করা যায় না। ফলে আইনস্টাইনের চিন্তায় এগুলো 'কোন ভাবে সম্পর্কিত' অথবা 'ধারণাগত পদ্ধতির প্রতিজ্ঞাসমূহকে দৃঢ়ভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাগুলোর সাথে যুক্ত থাকতে হবে – ইত্যাদি কথা অনেকটাই ধোঁয়াশে সুত্রায়নের মত মনে হতে পারে। তবে তাঁর মতে 'একটি পদ্ধতি' গড়ে তোলার জন্য কিছু বিধি স্থির করা প্রয়োজনীয়, যেমন কোন খেলা খেলতে হলে নিয়ম থাকতে হয়, যদিও নিয়মগুলো অনেকটা স্বেচ্ছাক্রমে স্থিরকৃত, তাহলেও এর মাধ্যমেই খেলাটি সম্ভব। অবশ্য বিধিগুলোর পরিবর্তন হতে পারে বাস্তব-পরিপ্রেক্ষিতে।

পরিশিষ্ট - ৩

রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম

আইনস্টাইনের সাথে ১৯৩০ সালে আলাপচারিতায় এই মনুষ্য ধর্ম প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা যে মহাবিশ্ব দেখি তাকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন 'মানবীয় মহাবিশ্ব' কারণ মানুষের অসীম ব্যক্তিত্ব মহাবিশ্বকে অনুধাবন করতে পারে। একথার মধ্য দিয়েই কবিগুরুর 'মানুষের ধর্ম' এই অভিব্যক্তির মূল ভিতটি বের হয়ে এসেছে। মানুষ বলতে কবি কতগুলো স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের যোগফল নয়, একটি কঠিন পদার্থে জড় কণাগুলো যেমন তাদের মাঝে শূন্য স্থান (void) থাকা সত্তেও বিজ্ঞানের সূত্রে পরস্পর লেগে থেকে কঠিন পদার্থের রূপ নেয়, ঠিক অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র মানব সত্তাগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে মনুষ্য জগতের জীবন্ত ঐক্য - এই সত্তাই হল মানব বা মানব সত্তা। এই মানব সত্তা অর্থাৎ আমরা 'স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে আছি - এটি হল মানবীয় মহাবিশ্ব।' একজন মানুষের দু॥খে অন্য মানুষ এগিয়ে আসে সে দুঃখ নিরাময়ে, কারণ 'সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত'। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ধর্মের দুটি দিক রয়েছে ঃ একটি হল তার জীব সত্তা অন্য যে কোন জীবের মতই তার রয়েছে জৈবিক সীমাবদ্ধতা- তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা রয়েছে, তার রয়েছে স্বার্থ

---

[৪৫] Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason* (tr. N K Smith), MacMillan, London, 1964

[৪৬] Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal,* 121, 1936

পরায়নতা; রয়েছে ক্রোধ-হিংসা-কামনা-বাসনা প্রভৃতি ষড় রিপু; এই ক্ষুদ্র মানুষ নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য যে কোন অন্যায় কাজ এমন কি হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হতে পারে। আবার এই মানুষই বিপন্ন মানুষকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই মানুষের মধ্যেই রয়েছে প্রেম প্রীতি, ভালবাসা পরার্থে জীবন বিলিয়ে দেবার মহান ব্রত, তার মধ্যে রয়েছে শিব-সুন্দর-মঙ্গলমের সাধনা। পরের হিতার্থে এই মানুষের রাজাই অকাতরে রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ভিখিরীর জীবন বেছে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি অর্থাৎ ভালবাসা হল মনুষ্য ধর্মের প্রকাশ। জীব মানুষ শত্রুকে হত্যা করতে পিছপা হয় না, কিন্তু মহামানুষ বলে "শত্রুকে ক্ষমা করো।" গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দাও, যিশুর এ কথা কেবল আপ্ত বাক্য নয়, মহৎ মানুষের ধর্ম। এসব গুণাবলীকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' [৪৭] - যে ধর্ম ব্যক্তি মানুষের সীমানা অতিক্রম করিয়ে মহত্তর মানুষে পরিণত করে। এই মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন 'মহামানব, অতিমানব বা বিশ্বমানব।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই মানবতাবোধ নিজের মধ্যেই রয়েছে, এই মানবকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই – আমাদের অন্তরেই তার বাস, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব, তবে আমাদের অন্তরেই তার অধিষ্ঠান, "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'। মানুষের আর একটি বিশেষ ধর্ম হল সে স্বল্পে তুষ্ট নয়, নিজের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞান তাকে তৃপ্ত করে না– সে জানতে চায় মহাবিশ্বকে, ভূমাকে জানতে চায়। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। মানুষ চায় অল্পে সুখ নেই বৃহতেই সুখ"।
কবিগুরর ভাষায় ...

> "মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে আন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরে দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌচেছে বিশ্ব মানসলোকে – যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। ... মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। .... এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকের নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমা সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।"

ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু ছাত্রের উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলেন, নিজের আত্মার মধ্যেই তার উপলব্ধি। 'আপনি কে ?' সেই আমি সোহহং। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ মুনুষ্যজীবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'মহামানব'। আইনস্টাইনের সাথে আলাপচারিতায় এই মহামানবের প্রসঙ্গে উক্তি করেছিলেন, "ব্যক্তি আমির অস্তিত্বে অতি ব্যক্তিক মানুষের (super personal man) ও বিশ্বজনীন শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনাই আমার ধর্ম। এটিই ছিল আমার হিবার্ট বর্ক্তৃতার বিষয়, যাকে আমি অভিহিত করেছি "মানুষের ধর্ম "নামে। [৪৮]

এই মানুষ ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যেতে পারে তার জিজ্ঞাসা, তাতেই সে পৌছে যাবে বিশ্বগত জ্ঞানের বিশ্বে, প্রতিষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান। তবে এই লুকিয়ে থাকা মনুষ্যই হল রবীন্দ্রনাথের কহু কবিতার 'তুমি'। রবীন্দ্রনাথ বলেন এই তুমি অন্তরেই বিরাজমান। "মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানূষকে পাই – অন্তরে বিকার ঘটলে সেই

---

[৪৭] 'মানুষের ধর্ম ' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩। এই পুস্তকের তিনটি প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে ১৬, ১৮ ও ২০ শে জানুয়ারীতে কবি 'কমলা বক্তৃতা' নামে পাঠ করেছিলেন। ঐ বছরেই ৮, ৯, ও ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। ১৯৩৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালযের এক গ্রন্থমালায় ' Man ' নামে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষার এই রচনা তিনটি মে মাসে ১৯৩৪ সালে ' The Viswa-Bharati News' এ, অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ' Modern Review ' তে যথাক্রমে ' Man, Super Man ও I Am He ' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

[৪৮] ১৯৩০ সালে মে মাসের ১৯, ২১ ও ২৬ তারিখে অক্সফোর্ডে ম্যান্চেস্টার কলেজে হিবার্ট বক্তৃতায় ' The Religion of Man ' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বক্তৃতা দিযেছিলেন ইংরেজীতে। ১৯৩১ সালে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *The Religion of Man*, Rabindranath Tagore, 1931.

আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে।” অনেক কবিতার মধ্যে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যাক নমুনা স্বরূপ ঃ

প্রভূ, তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মোর ভাল লাগে। (গীতাঞ্জলি)

অথবা,

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রধীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস –
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস। (গীতাঞ্জলি)

বাউল কবির

“আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে ।”

এই বাণী কবির ভাষায় পেল নতুন ব্যঞ্জনা। সেই বাউলই আবার বলছেন, সে মানুষ অন্তরের গভীরে – “তোরই ভিতর অতল সাগর।” এবং বলেছিল, “মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।” সেই অতিমানবের সন্ধানে কবি লিখেছেন অজস্র কবিতা, তারই সন্ধানে–

“ ... মৃত্যুরে না কর শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে জানি না। চিনি নাই তারে।
শুধূ এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে ... ..
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। ”.

মানুষের ধর্ম হল,
“সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত, আবেরা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত। সব্বে সত্তা দুকখপমুঞ্চন্ত। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।”

ড. অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক; বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। মানবতাবাদী ও মানবাধিকার রক্ষায় সদা উচ্চকণ্ঠ এ বিজ্ঞানী চেতনা চিন্তায় প্রকৃতিবাদী ও সংশয়বাদী এবং মনেপ্রাণে সেক্যুলারিস্ট। ছাত্রাবস্থা থেকে ভাষা আনোদালনসহ সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এরই স্বাভাবিক পরিণতি। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন সহস্রাধিক প্রবন্ধ। সে তুলনায় পুস্তক লিখেছেন অনেক কম। তাঁর লেখা ‘আদি বাঙালী’ ও ‘জড়ের সন্ধানে’ শিরোনামে গ্রন্থ দুটি পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ৫খন্ডে লেখা 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান কোষের' অন্যতম সম্পাদক ও লেখক। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে যুক্ত। ইতিহাস পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি ও দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগঠনের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য। ইমেইল: roya_k2003@yahoo.com